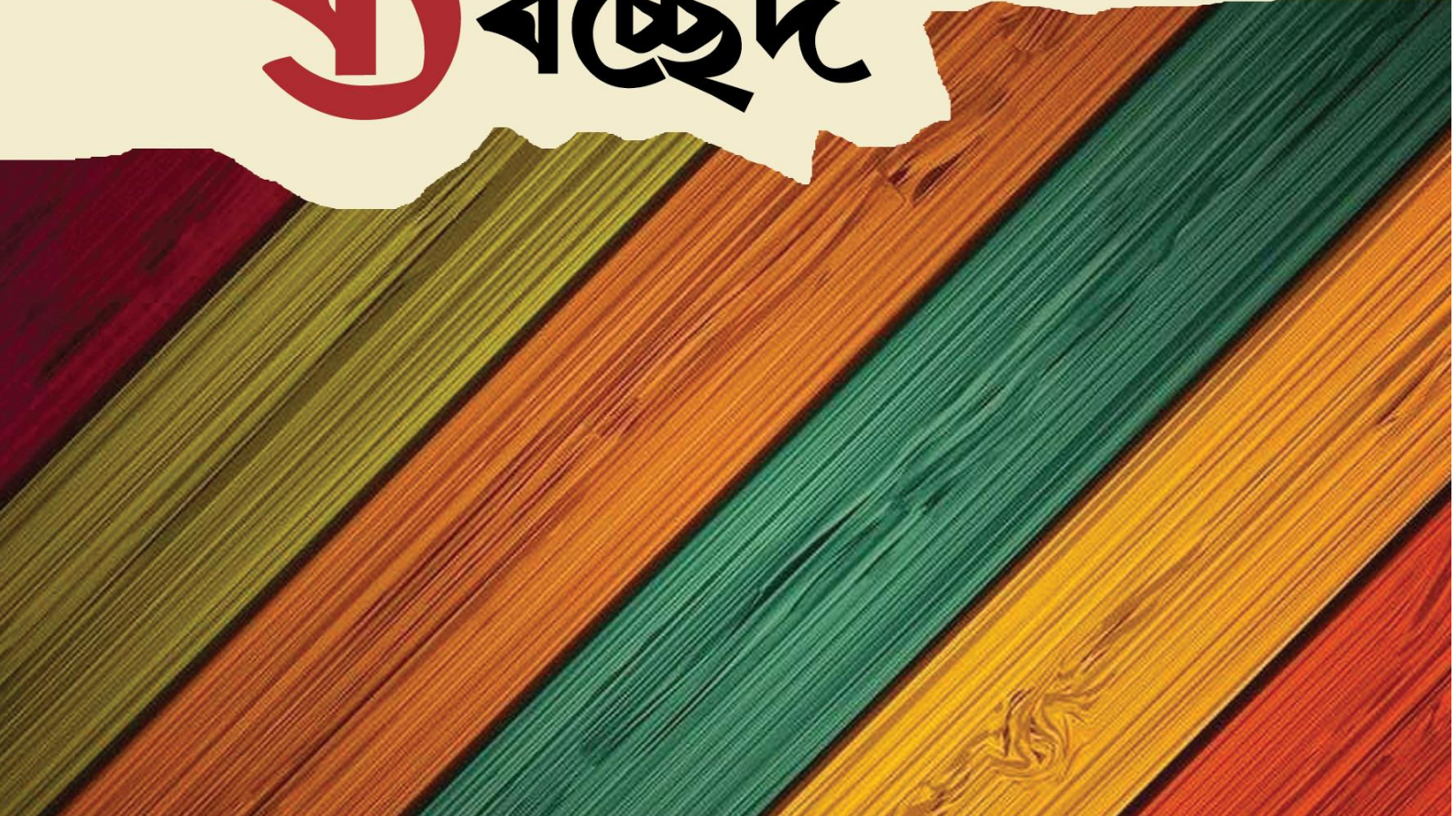


এহসানুল হক জসীম

বাংলাদেশের
ইসলামি
ব্যবস্থা জর্নীতির
বহুদ



বাংলাদেশের ইসলামি রাজনীতির ব্যবচ্ছেদ

এহসানুল হক জসীম



গাড়িয়ানা

পা ব লি কে শ ন স

প্রকাশকের কথা

মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাদেশে ইসলামি রাজনীতি সব সময়ই প্রাসঙ্গিক ছিল, আছে এবং থাকবে। ইসলামের রাজনৈতিক চিন্তাধারার প্রবক্তাদের অব্যাহত প্রচেষ্টার ফলে আজ ইসলামি রাজনীতির দার্শনিক ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত এবং তার অবস্থান ও আবেদন বাংলাদেশের সামগ্রিক রাজনীতিকে বেশ ভালোভাবেই স্পর্শ করে। ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামি রাজনীতির এক দীর্ঘ ইতিহাস ও ঐতিহ্য রয়েছে। সাফল্য আছে, ব্যর্থতাও আছে।

দুটো দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ইসলামি রাজনীতিকে পর্যালোচনা করা যায়। প্রথমত, ইসলামি রাজনীতির চর্চার শুরু থেকে আজতক অর্জিত সফলতা সামনে এনে আগামী দিনের পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং দ্বিতীয়ত, কৃত ভুল-ত্রুটি সামনে এনে আগামীর নিখুঁত পরিকল্পনা প্রণয়ন। প্রথম দৃষ্টিভঙ্গিকে সামনে রাখলে আত্মতুষ্টির একটা দেয়াল ত্রুটি-বিচ্যুতিকে আড়াল করে। আর দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গিকে সামনে আনলে আগামী দিনের জন্য তুলনামূলক ভালো পরিকল্পনা প্রণয়ন করা সম্ভব হবে, সফলতার একটা তৃষ্ণা জাগবে। এহসানুল হক জসীম তার ‘বাংলাদেশের ইসলামি রাজনীতির ব্যবচ্ছেদ’ গ্রন্থে দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গিকে সামনে রেখে ইসলামি রাজনীতিকে দেখেছেন এবং প্রয়োজনীয় পর্যালোচনায় কলম চালিয়েছেন।

ইসলামি রাজনীতি নিয়ে সত্যিকারের ফলপ্রসূ গবেষণা আমাদের দেশে হয় না। নানান মিথ আর প্রিজুডিস ধারণা নিয়ে ইসলামি রাজনীতিকে সাগরে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে। তথ্য-প্রমাণ আর একাডেমিক ডিসকোর্স ছাড়াই সমালোচকরা ইসলামি রাজনীতির সমালোচনা করে নিষ্ঠুরভাবে। অন্যদিকে, আবেগে উদ্বেলিত হয়ে সংকট ও সমস্যাকে উপেক্ষা করা হয়েছে যুগযুগ ধরে। এই গ্রন্থে লেখক বাংলাদেশের ইসলামি রাজনীতি নিয়ে একটা পূর্ণাঙ্গ ছবি আঁকতে চেয়েছেন। পাঠকবৃন্দ এই গ্রন্থ থেকে ইসলামি রাজনীতি ও ইসলামি রাজনৈতিক দলসমূহ নিয়ে বিস্তারিত তথ্য ও পর্যালোচনা জানতে পারবেন।

আমরা লেখকের সব দাবি ও পর্যালোচনাকে শতভাগ নিখুঁত ও গ্রহণীয় বলে চাপিয়ে দিচ্ছি না। তবে আলোচনা-পর্যালোচনার একটা দরজা খুলে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। ইসলামি রাজনীতি নিয়ে ভাসাভাসা সমালোচনা বন্ধ করে তথ্য-উপাত্তের সঙ্গে একাডেমিক আলোচনা শুরু করা দরকার। ইসলামি রাজনৈতিক দলগুলো এই গ্রন্থকে একটা লিখিত ডকুমেন্টেড পর্যালোচনা হিসেবে গ্রহণ করতে পারে। সব চিন্তা ও পর্যালোচনার সাথে একমত হওয়ার দরকার নেই; অন্তত সংকটের ব্যাপারে সাধারণ ঐক্যমত যেখানে আছে, তা নিয়ে কাজ করা যেতে পারে।

মূলত গ্রন্থটি লেখকের এমফিল গবেষণার থিসিস পেপার। প্রতিটি পৃষ্ঠায় লেখকের পরিশ্রম উপলব্ধি করতে পারবেন। প্রচুর রেফারেন্স দেওয়া হয়েছে। আলোচিত বিষয়টি স্পর্শকাতর হওয়ায় মতামত দেওয়ার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকার চেষ্টা করা হয়েছে। পুরো বইয়ে নির্মোহ থাকার একটা প্রচেষ্টা দেখতে পাবেন। আমি পাঠকদের অনুরোধ করব, বইটি পড়ার সময় আপনারাও নির্মোহভাবে চিন্তা করবেন। এই কঠিন কাজে লেখক ও আমাদের কোনো ভুল হলে আন্তরিকভাবে শুধরে দেবেন। ইনশাআল্লাহ! আমরা নিজেদের ভুল নিয়ে জেদ করব না।

আমি সম্মানিত লেখকের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এই পরিশ্রম সফল হোক। বইটি প্রায় দেড় বছর ধরে সম্পাদনা করা হয়েছে। পুরো প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ইসলামি রাজনীতির পুনর্জাগরণে এই গ্রন্থ সামান্যতম ভূমিকা পালন করলেও আমাদের সকল পরিশ্রম সার্থক হবে।

নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের
বাংলাবাজার, ঢাকা
১৮ মে, ২০১৯

ভূমিকা

এহসানুল হক জসীমের লেখা বাংলাদেশের ইসলামি রাজনীতির ব্যবচ্ছেদ একটি আকর্ষণীয় গ্রন্থ। এটি লেখকের এমফিল ডিগ্রির জন্য তৈরি অভিসন্দর্ভ। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচিত একটি উত্তম অনুশীলনীয় এবং সুমার্জিত গবেষণা বই। বর্তমান প্রজন্মের জন্য এটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও প্রয়োজনীয় বটে। লেখকের মতে, ইসলামি রাজনীতির অপার সম্ভাবনাময় বাংলাদেশে ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলি একটির পর একটি আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এই ক্ষেত্রটি সংকুচিত করেছে। প্রশ্ন উঠেছে, বর্তমানে এর সম্ভাবনা এবং ভবিষ্যৎ কী?

বাংলাদেশ এমন একটি রাষ্ট্র যেখানে শতকরা ৯০ ভাগ নাগরিকের ধর্ম ইসলাম। শতকরা ৯৮ ভাগ মানুষের ভাষা বাংলা। শতকরা ৯৮ ভাগ নাগরিকের সংস্কৃতি, চিন্তা-চেতনা, সামাজিক মূল্যবোধ একই রকম। ৫৬ হাজার বর্গমাইলের ভূখণ্ডে ভৌগলিক পরিবেশ এবং আবহাওয়াও প্রায় একই ধরনের। জনগণও ধর্মাত্মক না হয়ে প্রচুর ধার্মিক। দেশে যে সকল হিন্দু, বৌদ্ধ এবং খ্রিষ্টান বসবাস করছেন, তারাও যুগ যুগ ধরে সহ-অবস্থান করছেন অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ অবস্থায়। এসব কারণে বাংলাদেশকে বলা হয় বিভিন্ন বিশ্বাস ও ধর্মের অনুসারীদের শান্তিপূর্ণ আলায়। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সুষম শান্তির আবাসভূমি। সাধারণভাবে অনেকেই মনে করেন, এমন জনপদে ইসলামি রাজনীতিই তো সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য হওয়ার কথা। কিন্তু তা নয় কেন? এজন্য কি ইসলামি রাজনীতি দায়ী? নাকি এজন্য দায়ী যারা ইসলামি রাজনীতির চর্চা করেন তারা? এমনকী এ জাতির শ্রেষ্ঠতম অবদান যে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ গড়ে তোলা হয়, সেক্ষেত্রেও বাংলাদেশের মুসলমানেরা পাকিস্তানের মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে পিছপা হননি। ইসলাম কোনোভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামের পথ রুদ্ধ করেনি। তারপরেও সাধারণ জনগণ কেন ইসলামি রাজনীতির প্রতি তেমনভাবে আকৃষ্ট নন— এসব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের চমৎকার বিশ্লেষণ রয়েছে এই বইটিতে। একবার পড়া শুরু করলে শেষ না করে উঠা সম্ভব নয়।

আমি লেখককে অভিনন্দন জানাই, বইটি লেখার জন্য। আশা করব, এটি পাঠকনন্দিত হবে।

অধ্যাপক ড. এমাজউদ্দিন আহমদ

সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর এমেরিটাস, ইউনিভার্সিটি অব ডেভেলপমেন্ট অন্টারনেটিভ।

তারিখ : ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯

লেখকের কথা

বাংলাদেশের রাজনীতি এবং ধর্মীয় রাজনীতি নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে, বেশকিছু বইও রচিত হয়েছে। ইসলামপন্থীদের রাজনৈতিক স্থিতিবস্থা ও সীমাবদ্ধতা নিয়ে বিশ্লেষণধর্মী পূর্ণাঙ্গ কোনো গ্রন্থ জানামতে রচিত হয়নি। দেশের জনসংখ্যা বিবেচনায় ভৌগলিক অবস্থান ও কৌশলগত কারণে ধর্মীয় রাজনীতি ও রাজনৈতিক দলগুলোর ওপর আলোচনা গুরুত্বের দাবিদার। বাংলাদেশ একটি গুরুত্বপূর্ণ মুসলিম দেশ। পৃথিবীর মোট মুসলিম জনগোষ্ঠীর উল্লেখযোগ্য অংশের বাস এখানে। এমন একটি দেশে ইসলামপন্থীরা আটকে আছে নানা কারণে। একগুয়েমি, এককেন্দ্রিকতা, রক্ষণশীলতা, জনবান্ধবহীন কর্মসূচি, সামাজিক চরিত্রের অনুপস্থিতি, বন্ধদুয়ার পরিবেশ, আধুনিক ধ্যানধারণার অভাব, উচ্চবিলাসী কল্পনা, প্রত্যাশিত মেধা ও জ্ঞানের সংকট, কাক্ষিত গুণ, গ্রহণযোগ্য নেতৃত্ব ও যোগ্যতার ঘাটতি, ঐতিহাসিক ও গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ইস্যু, প্রতিকূল মিডিয়া, ধর্মীয় ফেরকা, অনৈক্য, অস্থিরতা, বন্ধচিন্তা, অদূরদর্শিতা, উন্নত চরিত্রের ঘাটতিই এসব কারণ।

ইসলামপন্থীরা এসব বিষয়ে নাওয়াকিফ কি না জানি না। ইসলামি রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর অন্ধ বিরোধিতা এবং অন্ধ সমর্থন দুটোই রয়েছে। দুই ধরনের অন্ধত্বকে পরিহার করেই এই বইয়ে ইসলামপন্থীদের দেখা হয়েছে তৃতীয় চোখে। রাজনীতি, ইসলামি রাজনীতি, রাষ্ট্র, ইসলামি রাষ্ট্র, বিভিন্ন মতবাদ, ইসলামি সংগঠনসমূহের পরিচিতি ও পথ-পরিক্রমা, বর্তমান অবস্থা, সীমাবদ্ধতা ও সফলতার পথে অন্তরায়— এই বইয়ে নির্মোহভাবে আলোচনা করা হয়েছে। অনেক অপ্রিয় সত্য পাঠকের সামনে চলে আসবে। মানুষ সব সময় প্রশংসা শুনতে চায়, সমালোচনাকে বেশির ভাগ মানুষ অপছন্দ করে। কিন্তু ইতিহাসের নির্মোহ পাঠটা ভবিষ্যতের জন্য উন্মুক্ত করা উচিত। প্রজ্ঞাবান দল, আদর্শ এই গ্রন্থ থেকে আত্মপর্যালোচনা খোরাক পাবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। বিচ্ছিন্নভাবে আলোচনা কোনো সমাধান নয়; সমস্যাগুলোর গোছালো উপস্থাপনা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশের বিভিন্ন ইসলামি সংগঠন ও তাদের রাজনীতির ওপর গবেষণার ফসল বইটি। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিসন্দর্ভ রচনা করে ২০১৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমফিল ডিগ্রি লাভ করি। বইটি অবশ্য হুবহু অভিসন্দর্ভ নয়। অভিসন্দর্ভের পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত রূপ। বইটি লেখায় লেগেছে কয়েক বছর। চেষ্টা করেছি সর্বাত্মক সুন্দর ও ত্রুটিমুক্ত করার। এ ক্ষেত্রে প্রকাশনা সংস্থাও কাজ করেছে। কলেবর কমাতে অনেক কথা-ই বাদ দিতে হয়েছে। সুধী পাঠকের কাছে কোনো ত্রুটি ধরা পড়লে কিংবা কোনো পরামর্শ থাকলে অবহিত করার সনির্বন্ধ অনুরোধ রইল। কথা দিলাম, পরবর্তী সংস্করণে খেয়াল রাখব। অবনত মস্তকে শুকরিয়া মহান প্রভুর প্রতি, যার একান্ত অনুগ্রহে বইটি প্রকাশিত হচ্ছে। প্রকাশনা জগতে এসেই মন জয় করে নেওয়া সৃজনশীল প্রতিষ্ঠান ‘গার্ডিয়ান পাবলিকেশন’ বইটি প্রকাশ করায় ধন্য মনে করছি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর এবং ইউনিভার্সিটি অব ডেভেলপমেন্ট অল্টারনেটিভ-এর প্রফেসর এমেরিটাস ড. এমাজউদ্দীন আহমদ এর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি; দেশের প্রখ্যাত এই রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বইটির ভূমিকা লিখে দিয়ে কৃতার্থ করেছেন। আমার পর শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক ড. হাফিজ মুজতাবা রিজা আহমাদ-এর প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। একান্ত প্রিয় ছোটো ভাই আবুবকর চৌধুরী যেটুকু সময় ও শ্রম দিয়েছে; চিরঞ্চণী রয়ে গেলাম। আরও অনেকের কাছ থেকে অনেকভাবে সহযোগিতা পেয়েছি। তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করলে কৃপণতার বিশেষণে বিশেষায়িত হয়ে যাব। কয়েকজনের নাম উল্লেখ করছি— বিশিষ্ট রাজনীতিক মাওলানা আব্দুল লতিফ নেজামী, জেবেল রহমান গনি, আবু নাসের মোহাম্মদ রহমাতুল্লাহ, এম. গোলাম মোস্তফা ভূইয়া ও সাবেক এমপি শামী আক্তার, সাবেক নিউ নেশন সম্পাদক মোস্তফা কামাল মজুমদার, পেশার প্রিয় বড়ো ভাই আহমেদ আতিক ও তারেক সালমান, ব্যাংকার বড়ো ভাই হুসাইন আহমদ, লেখক ও গবেষক আব্দুল হাই আল-হাদী, সাংবাদিক এনামুল হাসান, কদরুদ্দিন শিশির, জাহাঙ্গীর আলম আনসারী, মোস্তফা আনোয়ার খান, তরুণ আলেমে দ্বীন শহীদুল ইসলাম কবির, মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক ও হাফেজ মাওলানা জিল্লুর রহমান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রিয় ছোটো ভাই গোলাম মোস্তফা, ইমদাদুর রহমান, ফয়েজ আহমদ ও বেহতারিন বিথী প্রমুখ।

বইটি লিখতে গিয়ে কাটাতে হয়েছে বহু বিন্দ্র রজনী। ধৈর্যের সাথে পাশে থেকে সহযোগিতা করেছে এহতেশামুল হক আবির ও এহতেশানুল হক আদিলের মা এবং আমার জীবসঙ্গিনী তাজমুন নাহার জাফরীন। মায়ের কাছ থেকে পেয়েছি উৎসাহ-উদ্দীপনা-অনুপ্রেরণা। তাঁর দীর্ঘায়ু কামনা করছি। বাবার রুহের মাগফেরাত কামনা করছি।

বইটি মূল্যায়ন করবে পাঠকেরা। সেই পাঠকদের প্রতি অগ্রিম শুভেচ্ছা রইল।

এহসানুল হক জসীম

১৮ মে, ২০১৯

ehsan.jasim@gmail.com

সারসংক্ষেপ

১৯৪৭ থেকে ২০১৯; দীর্ঘ সাত দশকেরও বেশি সময়। এর মধ্যে কোনো সময়ই ক্ষমতায় আসতে পারেনি এই ভূখণ্ডের ইসলামপন্থীরা। অবশ্য একবার আংশিকভাবে সরকারের ক্ষুদ্র অংশ ছিল। এই দীর্ঘ সময়ে এখন পর্যন্ত তারা জনগণের বৃহৎ অংশের সমর্থন আদায়ে ব্যর্থ। ইসলামের প্রতি দেশের বেশির ভাগ মানুষ দুর্বল। কম সংখ্যক মানুষ ইসলামি রাজনীতির প্রতি দুর্বল। সাধারণ মানুষ আলেম-ওলামাকে ভালোবাসে। তাদের দলকে সমর্থন করে না।

আয়তনে ক্ষুদ্র হলেও জনসংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশ মুসলিম বিশ্বের একটি বৃহৎ দেশ। এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ইসলাম ধর্মের অনুসারী। সাংবিধানিকভাবে এ দেশের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম। মুসলিম বিশ্বের আন্তর্জাতিক সংগঠন ওআইসিরও অন্যতম সদস্যরাষ্ট্র। এসব দিক বিবেচনায় বাংলাদেশে ইসলামি রাজনীতি বিকাশের পটভূমি রয়েছে। মোটামুটি দেশের শতকরা দশ ভাগ মানুষ বিভিন্ন ইসলামি রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করে। সামগ্রিক বিবেচনায় এ হার অনেক কম। তবুও অস্বীকার করার কোনোই সুযোগ নেই ইসলামি রাজনীতির এই অবস্থান। প্রায় নব্বই ভাগ মুসলিমের এ দেশে ধর্মান্ধতা-জঙ্গিবাদকে যেমন তীব্র ঘৃণার সাথে দেখা হয়ে থাকে; তেমনি ধর্মভিত্তিক সংগঠন বা ইসলামি রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিও দেশের জনগোষ্ঠীর একটা অংশের নৈতিক ও সরাসরি সমর্থন রয়েছে।

এ দেশে ইসলামের আগমন ঘটেছে বিভিন্নভাবে। ইসলাম প্রচারকদের মাধ্যমে যেমন এ দেশে ইসলামের আগমন ঘটেছে। রাজনৈতিকভাবেও ইসলামের বিস্তৃতি ঘটেছে। রাজনৈতিকভাবে ইসলামের বিস্তৃতি এ দেশে ইসলামি রাজনীতি বিকাশের পথ অনেকটা সুগম করেছে। রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে অমুসলিম শাসক তথা ইসলামবিরোধীদের সরাতে গিয়ে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়, সেসব পদক্ষেপের ফলে ইসলামি রাজনৈতিক দলের আবির্ভাব হয়; বিকাশ ঘটে ইসলামি রাজনীতির। ব্রিটিশ হঠানোর আন্দোলনে ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ রাজনৈতিক দল গঠনের প্রয়াস পান। বিভিন্ন গণতান্ত্রিক এবং প্রচলিত রাজনৈতিক দলের ব্যর্থতার সুযোগও এ দেশে ইসলামি রাজনীতির কিছুটা বিকাশের কারণ হতে পারে। আবার ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে মনে করে ধর্মপ্রাণ মুসলিমদের একটি অংশ ইসলামি রাজনীতি গ্রহণ করে।

কোনো কোনো ইসলামি সংগঠন রাজনীতিতে শক্তিশালী অবস্থানও তৈরি করেছে। ইসলামি রাজনীতির এই বিস্তৃতি ও অবস্থান নিয়ে পশ্চিমা বিশ্বসহ আন্তর্জাতিকমহল বেশ ভাবছে। বাংলাদেশ নিয়ে তাদের বেশ আগ্রহ রয়েছে। তবে সত্য হলো, বর্তমান বিশ্বে ইসলামপন্থীরা কঠিন বাস্তবতার সম্মুখীন। ইরান ছাড়া পৃথিবীর কোনো দেশে কোনো রাজনৈতিক দল ইসলাম কায়েম করতে পারেনি;

যদিও অনেকে এটাকে শিয়াইজম বলে অবিহিত করে থাকেন। অবশ্য তুরস্কে এখন ইসলামপন্থীরা ক্ষমতায়। কিন্তু ইসলাম কায়েম থেকে দূরে আছে। তুরস্কের ইসলামপন্থী ক্ষমতাসীনদের এ মডেল ‘তুর্কি মডেল’ হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। বাংলাদেশের ইসলামপন্থীদের উদার অংশটির কাছে ‘তুর্কি মডেল’ অনেক বেশি পছন্দের হলেও ইসলামপন্থীদের মূল নেতৃত্বের মধ্যে এখনও এ নিয়ে নেই কোনো ভাবনা।

মুসলিমরা বিভিন্ন সময় এ অঞ্চল শাসন করেছে। অন্যরাও শাসন করেছে। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে মুসলিম জনগোষ্ঠীর অবদান যেমন ছিল। ইসলামি সংগঠন এবং আলেম-ওলামারও ভূমিকা ছিল। অনেক আলেম ধর্মভিত্তিক সংগঠনের ব্যানারে ইংরেজবিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছেন। আবার অনেকে অন্য কোনো রাজনৈতিক আন্দোলনে शामिल হয়ে ইংরেজবিরোধী আন্দোলনকে বেগবান করেছেন। ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায়, আলেমরাই এ দেশে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের সূচনা করেন। ত্বরান্বিত করেন। ব্রিটিশদের চলে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাঁরা এ আন্দোলনকে বিভিন্নভাবে অব্যাহত রাখেন। ইংরেজবিরোধী আন্দোলনে শেষ পর্যন্ত সফলতা এলেও আলেমরা তার ফসল পুরোপুরি ঘরে তুলতে পারেননি। অন্য কথায় ইসলামি রাজনৈতিক সংগঠনগুলো ফসল ঘরে তুলতে পারেনি। এই অপ্রাপ্তির বিভিন্ন কারণ রয়েছে; ইসলামপন্থীদের রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা, রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে প্রকৃত ধ্যানধারণার অভাব, জ্ঞান ও যোগ্যতার ঘাটতি, সাধারণ জনগণের বড়ো অংশকে উপলব্ধি করতে পারার ব্যর্থতাসহ আরও বিভিন্ন কারণ।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আলেমরা প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে অনেক পরে আসলেও এ ভূখণ্ডে ইসলামি রাজনীতির ইতিহাস বেশ পুরোনো। ইসলামি রাজনীতি এ দেশে অনেক আগ থেকেই চলে আসছে। সাধারণ শিক্ষিতদেরও একটা বড়ো অংশ ইসলামি রাজনীতির সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত। কোনো কোনো ইসলামি রাজনৈতিক দলের শীর্ষ পর্যায় পর্যন্ত রয়েছেন সাধারণ শিক্ষিতরা। আবার কোনো কোনো দলের পুরো নেতৃত্বই সাধারণ শিক্ষিতদের হাতে। আবার কোনো কোনো ইসলামি রাজনৈতিক সংগঠন আলেম-ওলামা ও সাধারণ শিক্ষিতদের সমন্বয়ে পথ চলছে। তবে বেশির ভাগ ইসলামি রাজনৈতিক দল কেবল আলেম-ওলামা আর মাদ্রাসা শিক্ষিতদের নিয়ে।

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের আগে ও পরে ইসলামি সংগঠনগুলোকে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা মোকাবিলা করতে হয়েছে। শাসকগোষ্ঠীর রোষানলে পড়তে হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে এ দেশে ইসলামি রাজনীতি নিষিদ্ধ ছিল। ১৯৭১ সালের রক্তক্ষয়ী মুক্তি সংগ্রামের মাধ্যমে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পরপরই ইসলামি রাজনীতি কঠিন বাস্তবতার সম্মুখীন হয়। ধর্মীয় রাজনীতি নিষিদ্ধ ছিল। বর্তমানে যদিও ইসলামি রাজনৈতিক দলগুলোর কার্যক্রম নিষিদ্ধ নয়; তারপরও ইসলামি দলগুলোকে বেশ কিছু সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা মেনে চলতে হচ্ছে। বিভিন্ন ইসলামি সংগঠনকে যেকোনো সময় নিষিদ্ধ করার কৌশলও আছে সংবিধানে।

ব্রিটিশ, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ আমলে এখন পর্যন্ত জামায়াতে ইসলামী ছাড়া কোনো ইসলামি সংগঠন এককভাবে ১%ও ভোটও পায়নি। অবশ্য জামায়াতে ইসলামী দু'বার একটু বেশি ভোট পেয়েছিল। তথাপি তাদের ভোটের হারও খুব একটা বেশি নয়। শতকরা আট ভাগের ভেতরেই আছে। সব মিলিয়ে ইসলামি রাজনৈতিক দলগুলো যে খুব বেশি সফল, সে কথা কোনোভাবেই বলা যায় না। ইসলামপ্রিয় এ জনপদে ইসলামি রাজনৈতিক দলগুলোর কেনই-বা এ দূরবস্থা? এর উত্তরই খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে এই বইতে। চেষ্টা করা হয়েছে ইসলামি রাজনৈতিক দলগুলোর সাফল্য-ব্যর্থতা নিরূপণের। বিভিন্ন ইসলামি সংগঠনের পরিচয়, প্রতিষ্ঠার পটভূমি, বর্তমান সময়ে তাদের অবস্থান তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

বর্তমান বিশ্বে ইসলামপন্থীরা কঠিন বাস্তবতার সম্মুখীন। ইসলামি রাজনীতি কোথাও নিষিদ্ধ, কোথাও কঠিন পরিস্থিতি মোকাবিলা করছে। কোথাও ক্ষমতায় আছে; আবার কোথাও ক্ষমতায় এসে বৈরি পরিস্থিতির সম্মুখীন হচ্ছে কিংবা ক্ষমতায় এসেও বিদায় নিতে হচ্ছে। সমসাময়িক রাজনীতি, ইসলামি দুনিয়ার রাজনীতি, সারা বিশ্বের ইসলামি আন্দোলনের বর্তমান অবস্থা, বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটের পাশাপাশি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ইসলামি রাজনীতির বর্তমান অবস্থান ভূমিকা ও উপসংহার ছাড়া মোট পাঁচটি অধ্যায়ে তুলে ধরার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে।

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

রাজনীতি ও ইসলামি রাজনীতি	২১
রাজনীতি	২১
রাজনৈতিক দল	২৭
ইসলামি রাজনীতি	৩১
ইসলামি রাজনীতির শাসনিক উৎস ও ধারণা	৩৩
ইসলামি রাজনীতি ও ইসলামি আন্দোলন	৩৩
মদিনায় ইসলামি রাষ্ট্র ও ইসলামি রাজনীতি	৩৭
ইসলামি রাজনীতির ভিত্তি	৩৮
তাওহিদ	৩৮
রিসালাত	৩৮
খিলাফাত	৩৯
রাষ্ট্র	৩৯
আশ্রিত রাষ্ট্র	৪৩
রাষ্ট্রের স্তম্ভ	৪৪
নির্বাহী বিভাগ	৪৫
আইন বিভাগ	৪৯
বিচার বিভাগ	৪৯
প্রতিরক্ষা বিভাগ	৫০
ইসলামি রাষ্ট্র	৫২
শরিয়া ও আইন	৫৭
ইসলামি শাসনব্যবস্থার উদ্দেশ্য	৫৭
গণতন্ত্র	৫৯
গণতন্ত্রে সম মূল্যায়ন	৬৪
সংখ্যাগরিষ্ঠতার কথা, সংখ্যালঘিষ্ঠের শাসন	৬৬
গণতন্ত্র, বিরোধী দল ও নির্বাচন	৬৯
গণতন্ত্র ও পশ্চিমা বিশ্ব	৭১
তখনকার গণতন্ত্র ও আজকের গণতন্ত্র	৭৪

ইসলাম ও গণতন্ত্র	৭৬
রাজতন্ত্র	৮১
ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ	৮৫
সাচার কমিটির রিপোর্ট	৮৭
জাতীয়তাবাদ	৯১
সমাজতন্ত্র	৯৭

দ্বিতীয় অধ্যায়

ধর্মীয় রাজনীতি : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ ও বিশ্ব	১০১
বাংলাদেশের জনসংখ্যার ধর্মভিত্তিক বিভাজন ও রাজনৈতিক অবস্থান	১০৩
মুসলিমদের বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠী ও রাজনৈতিক বিভক্তি	১০৫
অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা	১০৯
জনগণের প্রত্যাশা	১১১
বাংলাদেশে ইসলামি রাজনীতি বিকাশের পটভূমি	১১১
বাংলাদেশে ইসলামের আগমন	১১২
উপমহাদেশে মুসলিম শাসন ও খিলাফাত	১২০
সিন্ধু বিজয়ের ফলাফল	১২১
ইসলামি রাজনীতি বিকাশে মুসলিম শাসন	১২২
মুসলিম শাসনের অবসান	১২৪
ইংরেজবিরোধী আন্দোলনের সূচনায় আলেম সমাজ	১২৫
ফকির-সন্ন্যাসী আন্দোলন	১২৬
ইসলামি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ও বালাকোট যুদ্ধ	১২৭
তিতুমিরের সংগ্রাম	১৩০
ফরায়েজি আন্দোলন	১৩০
১৮৫৭ সালের সিপাহী-জনতার বিপ্লব	১৩২
বিপ্লোত্তর আলেম সমাজ	১৩২
দারুল উলুম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠা ও পুনর্জাগরণ	১৩৩
আলিয়া মাদ্রাসা	১৩৬
ব্রিটিশ পিরিয়ডে মুসলিমদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান	১৩৭
কৃষক আন্দোলন ও ধর্মীয় রাজনীতি	১৩৯
পাকিস্তান আমলে ইসলামি রাজনীতি	১৪০
বাংলাদেশের সংবিধান ও ধর্মীয় রাজনীতি	১৪১

অন্যান্য দেশে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি ও সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা	১৪৫
গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা, নির্বাচন ও ইসলামি রাজনীতি	১৪৬
বাংলাদেশের বিভিন্ন নির্বাচনে ইসলামি দলের ভোটের চিত্র	১৫৩
ধর্মভিত্তিক রাজনীতি দেশে দেশে	১৫৪
মুসলিম বিশ্বের সমস্যা ও ইসলামি দুনিয়ায় অভ্যন্তরীণ কোন্দল	১৫৫
মিসর ও ইখওয়ানুল মুসলিমিন	১৫৬
তুরস্কের এদিন সেদিন	১৫৭
আরব বসন্ত ও মুসলিম বিশ্ব	১৬০
মুসলিম বিশ্বের বর্তমান ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট	১৬১
রাষ্ট্রধর্ম	১৬১
মুসলিম বিশ্বে রাষ্ট্র ও ইসলামের সম্পর্ক	১৬১
সাংবিধানিকভাবে ইসলামি রাষ্ট্র	১৬২
রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম	১৬৩
সেক্যুলার/ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র	১৬৪
অস্পষ্ট রাষ্ট্র	১৬৪
রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও মুসলিম বিশ্ব	১৬৪

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশের বিভিন্ন ইসলামি সংগঠন	১৬৬
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী	১৭০
জামায়াতের প্রতিষ্ঠা	১৭৪
প্রতিষ্ঠার পটভূমি	১৭৫
জামায়াতের যাত্রা শুরু	১৭৬
প্রথম ভাঙন	১৭৭
জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান ও জামায়াতে ইসলামী হিন্দ	১৭৭
পাকিস্তানের রাজনীতিতে জামায়াতে ইসলামী	১৭৮
বাংলাদেশে জামায়াতে ইসলামী	১৭৯
একাত্তরে জামায়াতের ভূমিকা এবং পরবর্তী অবস্থান	১৮২
জামায়াতের সীমাবদ্ধতা ও সংস্কার ইস্যু	১৮৩
জামায়াতের সাংগঠনিক অবস্থান	১৮৫
চতুর্থ উপজেলা পরিষদ নির্বাচন-২০১৪	১৮৬
চতুর্থ উপজেলা পরিষদ নির্বাচন-২০১৪	১৮৭

চতুর্থ উপজেলা পরিষদ নির্বাচন-২০১৪	১৯১
তৃতীয় উপজেলা পরিষদ নির্বাচন-২০০৯	১৯২
তৃতীয় উপজেলা পরিষদ নির্বাচন-২০০৯	১৯৩
তৃতীয় উপজেলা চেয়ারম্যান নির্বাচন-২০০৯	১৯৪
জামায়াত প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ দলের যারা বিভিন্ন সময় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন তাদের তালিকা	১৯৫
বিভিন্ন সময় নির্বাচিত জামায়াতের মহিলা এমপিগণ	১৯৬
জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম	১৯৬
প্রতিষ্ঠার পটভূমি	১৯৭
ভারতবর্ষের স্বাধীনতার দাবি	১৯৯
জমিয়তে ভাঙন	২০০
১৯৪৭ পরবর্তী জমিয়ত	২০০
বাংলাদেশে জমিয়তের কার্যক্রম	২০১
ইসলামী ঐক্যজোট	২০২
খেলাফত মজলিস	২০৪
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ	২০৬
জাকের পার্টি	২০৮
বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশন	২১০
নেজামে ইসলাম পার্টি	২১১
যুক্তফ্রন্ট সরকারে অংশগ্রহণ	২১২
মাওলানা আতহার আলি	২১৩
বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন	২১৪
বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট	২১৫
ইসলামী ঐক্য আন্দোলন	২১৬
হেফাজতে ইসলাম	২১৬

চতুর্থ অধ্যায়

ইসলামি দলের সফলতার পথে অন্তরায়	২১৯
জনগণ-জনস্বার্থ উপেক্ষিত ও জনবান্ধব চরিত্রের অনুপস্থিতি	২২১
আর্থ-সামাজিক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের কমতি	২৩৬
বন্ধদুয়ার পরিবেশ	২৪১
আধুনিক ধ্যানধারণার অভাব	২৪৮

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ইস্যু	২৫০
মালেক মল্লিসভার সদস্যবৃন্দ	২৫৭
সাতচল্লিশের দেশভাগ ইস্যু	২৬১
‘ডিম পাড়ে হাঁসে, খায় বাগডাসে’	২৬৫
আদর্শিক গণভিত্তির অভাব	২৭৭
ভঙ্গুর গণতন্ত্র ও প্রচলিত নির্বাচন ব্যবস্থা	২৮০
অদূরদর্শিতা, অস্থিরতা ও ঘন ঘন সিদ্ধান্ত পরিবর্তন	২৮৬
আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট, জনমানস ও বৈষয়িক স্বার্থ	২৯২
আদর্শচ্যুতি, উন্নত চরিত্র ও নৈতিকতার ঘাটতি	২৯৪
ব্যবসা-বাণিজ্য ও আয়-রোজগারে অধিক ঝোঁক	২৯৭
লোভ ও স্বার্থপরতা	২৯৯
বক্তব্য সঠিকভাবে উপস্থাপনে ব্যর্থতা	৩০১
বৈশ্বিক প্রতিকূল অবস্থা	৩০৫
শিক্ষাব্যবস্থা	৩০৬
জঙ্গিবাদের অব্যাহত প্রচারণা	৩০৯
ভোটের রাজনীতিতে কৌশলের অভাব	৩১৬
ধর্মীয় ফেরকা ও ছোটোখাটো বিষয়ে মতবিরোধ	৩২০
অনৈক্য এবং ঘন ঘন ভাঙা-গড়ার খেলা	৩২৫
আলেম-ওলামাদের সমর্থন না থাকা	৩২৯
নারীর বিষয়ে গ্লাস সিলিং অবস্থান	৩৩২
সংখ্যালঘু বিষয় উপেক্ষিত	৩৩৯
কূটনৈতিক পলিসির অনুপস্থিতি	৩৪৪
সাহিত্য-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে দীনতা ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসন	৩৪৮
বদ্ধচিন্তা, বুদ্ধিবৃত্তিক সংকট	৩৫২
রক্ষণশীলতা	৩৫৪
ফতোয়াবাজি, বাড়াবাড়ি, সংকীর্ণমনতা ও অসহিষ্ণুতা	৩৬৪
মিডিয়ায় অবহেলা ও প্রতিকূল মিডিয়া	৩৬৬
শ্রমজীবী ও মেহনতি মানুষ সংশ্লিষ্ট কর্মসূচির অনুপস্থিতি	৩৭৬
জ্ঞান ও যোগ্যতার ঘাটতি এবং ক্যারিয়ারের প্রতি উদাসিনতা	৩৭৮
এককেন্দ্রিকতা	৩৮৩
থিংক ট্যাংক-এর অনুপস্থিতি : বিশেষজ্ঞ, পেশাজীবী ও বুদ্ধিজীবীদের মূল্যায়নের অভাব	৩৮৪

সুনির্দিষ্ট ও মেয়াদি পরিকল্পনার অনুপস্থিতি এবং কৌশল পুনর্বিন্যাসের অভাব	৩৮৬
পদলোভ ও পরিবারতন্ত্র, দলের অভ্যন্তরে গণতন্ত্র চর্চার অভাব	৩৮৮
বিজ্ঞান ও গবেষণা এবং তথ্য-প্রযুক্তিতে দীনতা	৩৯২
মধ্যপন্থা ও সহজপন্থা গ্রহণে অনীহা	৩৯৫
ক্লারিয়ন কলের নেতৃত্বের অনুপস্থিতি	৩৯৮

৫ম অধ্যায়

একাদশ সংসদ নির্বাচন, পরিবর্তিত প্রেক্ষাপট এবং ইসলামপন্থীদের করণীয়	৪০১
একনজরে একাদশ সংসদ নির্বাচন	৪০১
ইসলামি দলগুলোর সাড়ে ৫শত প্রার্থী	৪০২
ইসলামপন্থীদের আসন মাত্র একটি!	৪০৩
প্রশ্নবিদ্ধ ও বিতর্কিত নির্বাচন : ৯৪% অনিয়মের ভোট	৪০৪
১৫৪ প্রার্থীর ভোট বর্জন : দলীয়ভাবে জামায়াতের ভোট বয়কট	৪০৫
বিভিন্ন ইসলামি দলের যেসব প্রার্থী ভোট বর্জন করেন :	৪০৬
(১ থেকে ২৫ নং ক্রমিক পর্যন্ত প্রার্থীরা জামায়াতের)	
ঐকফ্রেন্টে দ্বিমুখী নীতি	৪০৮
লাভমান গণফোরাম, ক্ষতিগ্রস্ত ইসলামপন্থীরা	৪০৮
শেষ রাতে তিন আসন ছাড়ল জামায়াত	৪০৯
একলা চলো নীতিতে জামায়াত	৪০৯
ইসলামপন্থীদের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি	৪১০
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ ইসলামি দল হওয়ার চেষ্টা	৪১১
দশ দফা সুপারিশ	৪১২
উপসংহার	৪১৯
গ্রন্থপঞ্জি	৪২৩

ইসলামি দলের সফলতার পথে অন্তরায়

বিভিন্নভাবে বাংলাদেশের ইসলামি রাজনৈতিক দলগুলো পিছিয়ে আছে। ভোটের রাজনীতি তথা জনগণের রাজনীতিতেও অনেক পিছিয়ে। ১৯৯১ সালের নির্বাচনে কোনো কোনো ইসলামি দল একটু ভালো করলেও, আর কোনো নির্বাচনে আশানুরূপ ভোট পায়নি। ১৯৯১ সনের নির্বাচন বাদ দিলে এ পর্যন্ত কোনো নির্বাচনে সব কয়টি ইসলামি দল মিলিয়ে সম্মিলিত ভোট ১০% পায়নি। কিন্তু সংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশের ইসলামি দলের সংখ্যা কম নয়। এ দেশের মানুষ ইসলামপ্রিয়। হয় তারা ধার্মিক নয়তো ধর্মপ্রাণদের ভালবাসে। তারা ইসলামের প্রতি দুর্বল। কিন্তু কেন তারা ইসলামি রাজনীতির প্রতি দুর্বল নয়? কেন ইসলামি রাজনৈতিক দলগুলো জনগণের মন জয় করতে পারছে না? দীর্ঘদিন থেকে থেকে এই দলগুলো আটকে আছে একই আবর্তে। ইসলামি দলগুলোর সমস্যা কী? এ দলগুলোর নেতা-কর্মীদের সমস্যা কী? জনগণের সমস্যা কী? পরিবেশ-পরিস্থিতির কোনো সমস্যা আছে কি? আধুনিক বাংলাদেশে ইসলামপন্থীদের চ্যালেঞ্জ কী কী? এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে ইসলামি রাজনীতির সফলতার পথে অন্তরায়ের কারণগুলো বিভিন্ন পয়েন্টে তুলে ধরা হলো :

১. জনগণ-জনস্বার্থ উপেক্ষিত ও জনবান্ধব চরিত্রের অনুপস্থিতি
২. আর্থ-সামাজিক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের কমতি
৩. বন্ধদুয়ার পরিবেশ
৪. আধুনিক ধ্যান-ধারণার অভাব
৫. একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ইস্যু
৬. সাতচল্লিশের দেশভাগ ইস্যু
৭. ডিম পাড়ে হাঁসে, খায় বাগডাসে : ঐতিহাসিক মূহুর্তে ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ
৮. আদর্শিক গণভিত্তির অভাব
৯. ভঙ্গুর গণতন্ত্র ও প্রচলিত নির্বাচনব্যবস্থা
১০. অদূরদর্শিতা, অস্থিরতা ও ঘনঘন সিদ্ধান্ত পরিবর্তন
১১. আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট, জনমানস ও বৈষয়িক স্বার্থ
১২. আদর্শচ্যুতি, উন্নত চরিত্র ও নৈতিকতার ঘাটতি
১৩. ব্যবসা-বাণিজ্য ও আয়-রোজগারে অধিক ঝোঁক
১৪. লোভ ও স্বার্থপরতা

১৫. বক্তব্য সঠিকভাবে উপস্থাপনে ব্যর্থতা
১৬. বৈশ্বিক প্রতিকূল অবস্থা
১৭. শিক্ষাব্যবস্থা
১৮. জঙ্গিবাদের অব্যাহত প্রচারণা
১৯. ভোটের রাজনীতিতে কৌশলের অভাব
২০. ধর্মীয় ফেরকা ও ছোটোখাটো বিষয়ে মতবিরোধ
২১. অনৈক্য এবং ঘন ঘন ভাঙা-গড়ার খেলা
২২. আলেম-ওলামাদের সমর্থন না থাকা
২৩. নারীর বিষয়ে গ্লাস সিলিং অবস্থান
২৪. সংখ্যালঘু বিষয় উপেক্ষিত
২৫. কূটনৈতিক পলিসির অনুপস্থিতি
২৬. সাহিত্য-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে দীনতা এবং সাংস্কৃতিক আত্মসন
২৭. বুদ্ধিচিন্তা, বুদ্ধিবৃত্তিক সংকট
২৮. রক্ষণশীলতা
২৯. ফতোয়াবাজি, বাড়াবাড়ি ও সংকীর্ণমনতা
৩০. মিডিয়ায় অবহেলা ও প্রতিকূল মিডিয়া
৩১. শ্রমজীবী ও মেহনতি মানুষ সংশ্লিষ্ট কর্মসূচির অনুপস্থিতি
৩২. জ্ঞান ও যোগ্যতার ঘাটতি এবং ক্যারিয়ারের প্রতি উদাসিনতা
৩৩. এককেন্দ্রিকতা
৩৪. থিংক ট্যাংকের অনুপস্থিতি : বিশেষজ্ঞ, পেশাজীবী ও বুদ্ধিজীবীদের মূল্যায়নের অভাব
৩৫. সুনির্দিষ্ট ও মেয়াদি পরিকল্পনার অনুপস্থিতি এবং কৌশল পুনর্বিন্যাসের অভাব
৩৬. পদলোভ ও পরিবারতন্ত্র এবং দলের অভ্যন্তরে গণতন্ত্র চর্চার অভাব
৩৭. বিজ্ঞান, গবেষণা ও তথ্য-প্রযুক্তিতে দীনতা
৩৮. মধ্যপন্থা ও সহজপন্থা গ্রহণে অনীহা
৩৯. ক্লারিয়ন কলের নেতৃত্বের অনুপস্থিতি

জনগণ-জনস্বার্থ উপেক্ষিত ও জনবান্ধব চরিত্রের অনুপস্থিতি

আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় নবি হজরত মুহাম্মদ (সা.)-কে পৃথিবীতে শুধু মুসলমানদের জন্য প্রেরণ করেননি। নবিকে প্রেরণ করেছেন গোটা মানবজাতির জন্য, মানবতার জন্য, সমগ্র বিশ্ব মানবতার কল্যাণ সাধনের জন্য।

কুরআনের বাণী—

‘হে নবি! আমি আপনাকে সমগ্র বিশ্বের রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছি।’ সূরা আশ্বিয়া : ১০৭
এখানে হজরত মুহাম্মদ (সা.)-কে কোনো বিশেষ সম্প্রদায়, দেশ কিংবা বিশেষ কোনো ধর্মের নবি হিসেবে উল্লেখ করা হয়নি। সমগ্র বিশ্বজগৎ বলতে দেশ, কাল, ধর্ম, বর্ণ, মুসলিম, অমুসলিম, মানুষ, অমানুষ তথা যতসব উদ্ভিদ ও প্রাণি আছে সবই অন্তর্ভুক্ত। এতে নিজ ধর্মের লোক যেমন আছে, তেমনি আছে অন্য ধর্মাবলম্বীও। এখানে নিজ দলের নেতা-কর্মী যেমন আছে, তেমনি আছে অন্য দলের নেতা-কর্মীও। নিজ পরিবার, স্ত্রী ছেলেমেয়ে যেমন আছে; তেমনি আছে আত্মীয়স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীও। নবির আদর্শ অনুকরণ করতে গেলে এসব বিষয় মাথায় রাখতে হবে। অবশ্যই মানুষ ও মানবতার কল্যাণের বিষয়টি নিজ চরিত্রের মধ্যে থাকতে হবে। নিজের চরিত্র হতে হবে জনবান্ধব, যেমনটি নবি ছিলেন। তিনি যেমন মনের দিক থেকে ছিলেন জনবান্ধব তেমনি বাহিরের দিক থেকেও জনবান্ধব।

সব ক’টি ইসলামি রাজনৈতিক দল হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আদর্শ মেনে সেই নবির আদর্শ বাস্তবায়নে কাজ করছে। তবে কেন জনবান্ধব চরিত্রসহ আরও বেশ কিছু ক্ষেত্রে নবিকে অনুসরণ করছে না? কেন তারা নবির মতো ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে ভালবাসতে পারছে না? নবুওত প্রাপ্তির পর তো বটে, নবুওয়ত প্রাপ্তির আগেও সেই ছোটোকাল থেকেই তিনি ছিলেন জনবান্ধব চরিত্রের অধিকারী। নবুওত প্রাপ্তির পূর্বে তাঁর জনবান্ধব চরিত্রের দিকটি ফুটে উঠে হেরা গুহায় হজরতের নবুওত প্রাপ্তির পরপর বাড়িতে ফেরার পর স্বীয় স্ত্রী হজরত খাদিজা (রা.)-এর কথায়। হাদিসটি এরকম, হজরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

‘মুহাম্মদ (সা.) তাঁর স্ত্রী খাদিজা (রা.)-কে হেরা পাহাড়ে ঘটে যাওয়া অহি ও জিবরাইলসংক্রান্ত সব কথা বলেন এবং ভয়াত চিত্তে বললেন, “আমি আমার জীবন সম্পর্কে আশঙ্কা করছি।” খাদিজা (রা.) সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, “আল্লাহর শপথ! তা কখনো হতে পারে না, তিনি আপনাকে অপদস্থ করবেন না। ১. আপনি আত্মীয়তার বন্ধন সংরক্ষণ করেন, ২. আপনি দুস্থ মানুষের বোঝা হালকা করেন, ৩. নিঃস্বদের আহার করান, ৪. অতিথিদের সেবা করেন ৫. সত্যের পথে নির্যাতিতদের সাহায্য করেন।”’^১

এ হাদিস অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে যে, আল্লাহ যে নবিকে ধ্বংস করবেন না— খাদিজার এমন আস্থা আর নবিকে এমন সান্ত্বনা দেওয়ার মূলে রয়েছে নবির জনবান্ধব চরিত্র। এখানে যে পাঁচটি গুণের উল্লেখ করা হয়েছে তার সবগুলোই জনগণের সাথে সম্পৃক্ত। জনবান্ধব এই চরিত্রের উপস্থিতি ছিল বলে খাদিজা (রা.) দৃঢ়তার সাথে সান্ত্বনা দিতে পেরেছিলেন। তার বিবরণ অনুযায়ী— নবুওয়ত প্রাপ্তির পূর্বেও নবিজি মানুষকে সহযোগিতা করেছেন, মানুষের ডাকে সাড়া দিয়েছেন, মানুষের কল্যাণে নিবেদিত ছিলেন। মানুষকে তিনি ভালবাসতেন। মানুষ প্রয়োজনে তাঁকে কাছে পেত।

১. বুখারি শরিফ, হাদিস নং-৩ (পরিচ্ছেদ : ১, ওহির সূচনা)

এসব গুণের কারণে নবিকে জনগণ ভালবাসতো। নবুওত প্রাপ্তির পূর্বে সেই জনগণই তো তাঁকে ‘আল-আমিন’ তথা সত্যবাদি উপাধি দিয়েছিল। ‘আল-আমিন’ বা বিশ্বাসী হওয়ার কারণেই যে ‘আল আমিন’ উপাধি পেয়েছিলেন, বিষয়টি এমন নয়। তৎকালীন আরবের সমাজ ব্যবস্থা অনেক বেশি কলুষিত হলেও, সে সমাজের বেশির ভাগ মানুষ অন্যায়-অনাচার-পাপাচারে লিপ্ত হয়ে পড়লেও কিছু বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী মানুষও ছিল। কিন্তু বিশ্বাসী বা সত্যবাদী হলেই উপাধি পাওয়া যায় না, সমাজও স্বীকৃতি দিয়ে দেয় না। সমাজ ও সমাজের মানুষ তখনই স্বীকৃতি দেবে যখন ওই বিশ্বাসী মানুষটি সমাজের সাথে মিশবে, মানুষকে নিয়ে কাজ করবে, জনগণের কথা বলবে। হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর চিন্তা-ভাবনার বিষয়ই ছিল মানুষ। নবুওত প্রাপ্তির পূর্ব থেকেই তো বটে; এমনকী সেই শৈশব-কৈশোর থেকে। মানুষ ও সমাজের কল্যাণ সাধনের প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে সেই কিশোর বয়সেই তো ‘হিলফুল ফুজুল’ সংস্থা গঠন করেছিলেন।

নবুওত প্রাপ্তির পূর্বে তিনি হেরা গুহায় গিয়েছিলেন মানুষের জন্য, নবি হওয়ার লোভে নয়। তিনি জানতেন না যে- ধ্যানমগ্ন হলে, হেরা গুহায় গেলে নবুওতি পাওয়া যাবে। সমাজের মানুষের মুক্তির নেশায় তিনি যখন দিশাহীন, মানুষের কল্যাণের পন্থা বিষয়ে তিনি যখন অনবগত; কিন্তু সমাজের বিশৃঙ্খল অবস্থা তাঁকে অস্থির করে তুলেছিল; সে অবস্থায় নবি মুহাম্মদ (সা.) নিজে একাকী শান্তিতে থাকার অভিপ্রায় নিয়ে সমাজ, সংসার, মানুষজন ফেলে চিরতরে নির্জন কোথাও চলে যাননি। মানুষের সমাজে থেকেই মানুষের জন্য পন্থা খুঁজে পাওয়ার আশায় হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন হন। হেরা গুহা নবির বসতির পাশেই ছিল। একটা নির্দিষ্ট সময়ে যেখানে তিনি ধ্যানমগ্ন থাকতেন। একটা সময়ে নিজের অজান্তেই নবুওতি পেলেন। নবুওত প্রাপ্তির পর সেই জনগণের কাছেই তিনি গিয়েছেন তাওহিদের দাওয়াত নিয়ে। শুধু তাওহিদের দাওয়াতই দিয়েই ক্ষান্ত হননি; জনগণের কল্যাণ সাধনেও কাজ মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত।

মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন জন্ম থেকে সকল বিষয়ে ব্যতিক্রম। তার বাল্যকাল, কৈশোর ও যৌবনকাল কেটেছে আরব জাহেলিয়াতের মধ্যে। পাপকে ঘৃণা করো, পাপীকে নয়। অন্যায়-পাপাচারে যারা লিপ্ত জাহেলি সমাজের সেই মানুষকেই তিনি ভালবেসেছিলেন। তাদের জন্যই ছিল তাঁর চিন্তা, তাদের মধ্যেই ছিল তাঁর জনবান্ধব চরিত্রের উপস্থিতি।

হজরত আলি (রা.) বলেন—

‘রাসূলুল্লাহ (সা.) যেন সর্বদা নিমজ্জিত ছিলেন ব্যাথার সমুদ্রে, ছিলেন চিন্তার মহাজগতে এবং সদা অস্থির অবস্থায়।’

৪০ বছর বয়সে তাঁর এই অস্থিরতা অসহ্য অবস্থায় পৌঁছে। তিনি অহি নাজিলের তিন বছর পূর্ব হতে প্রতি রমজান মাস ব্যক্তিগত ইবাদাত ও ধ্যানে কাটাতেন মক্কার অদূরে জাবালে নুরের চূড়ায় এবং গুহায়। তাঁর ধ্যান ও চিন্তার অন্যতম বিষয় ছিল মানবসমাজ ও বিপর্যস্ত মানবতা। এমনই ধ্যানমগ্ন অবস্থায় ৪০ বছর পূর্ণ হলে রমজানে শেষ দিকে রাতে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে

ওহি নিয়ে আবির্ভূত হলেন জিবরাইল (আ.)। রাসূল (সা.) অস্থির মনে হেরা গুহা ত্যাগ করে ঘরে গিয়ে খাদিজাকে বলেন—

‘আমাকে কস্বল জড়িয়ে দাও, কস্বল জড়িয়ে দাও, আমার জীবনের বিষয়ে আমি ভয় করছি।’

হজরত খাদিজা (রা.) ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রিয়তমা স্ত্রী। মুহাম্মদ (সা.)-এর সামাজিক ও মানবীয় চরিত্র যা খাদিজা (রা.) বর্ণনা করেছেন সেগুলোই শিক্ষা, যা উম্মতের জন্য গ্রহণীয়।

কোনো আদর্শকে পৃথিবীর মাটিতে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে দুটো বিষয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। একটি হলো গতিশীল নেতৃত্ব আর দ্বিতীয়টি হলো কর্মীদের গুণাবলি। একটি আন্দোলনকে বিজয়ী করার জন্য যেসব সামাজিক চরিত্র থাকা প্রয়োজন-এর সবগুলোই ছিল রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চরিত্রে বিরাজমান। খাদিজা (রা.)-এর ভাষায় সেগুলো ফুটে উঠেছে। সেগুলো নিম্নরূপ :

১. মানবতার প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা
২. দুস্থ ও নির্যাতিত মানুষের মুক্তির প্রচেষ্টায় নিয়োজিত থাকা
৩. মানুষের মৌলিক প্রয়োজন পূরণে সক্রিয় অংশগ্রহণ
৪. আত্মীয় ও প্রতিবেশীর সেবায় সর্বদা ব্যস্ত থাকা
৫. সত্যের পথে নির্যাতিতদের জন্য সর্বস্ব কুরবানির সিদ্ধান্ত গ্রহণ

নবির আদর্শ বাস্তবায়নের আন্দোলনকারী বর্তমান সময়ের ইসলামি রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীদের চরিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এরা তুলনামূলক চরিত্রবান। দুর্নীতির সাথে সম্পৃক্ততা কম। মানুষের ক্ষতি এদের দ্বারা কম সাধিত হয়। কিন্তু জনবান্ধব চরিত্র তাদের মধ্যে নেই। মানুষের কাজে খুব একটা দেখা যায় না। শুধু ইসলামি রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মী নন; বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ইসলামপন্থী ধার্মিকদেরও জনগণের কাজে খুব একটা দেখা যায় না। কিন্তু শুধু নৈতিক চরিত্রের মাধ্যমেই একটি আন্দোলনকে বিজয়ী করা যায় না।

ইসলামি আন্দোলনের মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে জনপ্রিয়তা। সমাজ পরিবর্তন করতে হলে প্রয়োজন সম্মিলিত মতামত বা জনমতের পরিবর্তন সাধন। কোনো সমাজ বা রাষ্ট্রব্যবস্থা কিংবা শাসক টিকে থাকে ওই ব্যবস্থা বা শাসকের প্রতি জনগণের সক্রিয় বা নীরব সমর্থনের মাধ্যমে। তুরস্কে ২০১৬ সালের সামরিক কু্য ব্যর্থ করে দেওয়া এবং প্রেসিডেন্ট রেজেপ তায়্যিপ এরদোয়ানের ক্ষমতায় টিকে থাকার মূলে রয়েছে ওই জনপ্রিয়তা, জনগণের সক্রিয় ও নীরব সমর্থন।

জনমত একটি সমাজে শাসন কর্তৃত্বের ভিত্তি, রাজনীতির ভিত্তি। যারা সমাজ পরিবর্তন করতে চায়, তাদেরকে অবশ্যই জনসাধারণের সাথে মিশতে হয়। প্রফেসর ড. ইউসুফ আল কারজাভি বলেন—

‘ইসলামি আন্দোলন তখনই সফল হবে যখন জনগণকে সাথে নিয়ে চলতে সক্ষম হবে।

জনগণের আন্দোলনের স্বার্থের সাথে একাত্ম হয়ে আন্দোলনের সমস্যা বা সংকট নিজের বিপদাপদ মনে করবে। আন্দোলনের আনন্দ তাদের আনন্দের কারণ হবে,

আন্দোলনের সকল ভূমিকা, অবস্থান ও প্রচেষ্টার তারা প্রশংসা করবে এবং শত্রুকে অভিসম্পাত দেবে। ইসলামি আন্দোলন তখনই সফল হবে যখন শিরা-উপশিরার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত রক্তের মতো জনগণের সঙ্গে মিশে যাওয়ার প্রতি এর প্রচেষ্টা কেন্দ্রীভূত হবে। আন্দোলনের সম্পর্ক হবে দেহের সাথে আত্মা ও চোখের সাথে দৃষ্টির সম্পর্কের মতো। তখন জনতার শ্রোত ও ইসলামি আন্দোলন একাত্ম হয়ে যাবে। যেন একটিকে আরেকটি থেকে বিচ্ছিন্ন করা না যায়। এটি তখনই সম্ভব যখন ইসলামি আন্দোলন জনগণের স্বার্থ আপন করে নেবে, তাদের অনুভূতি, অভিব্যক্তির প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করবে, তাদের সুখ-দুঃখে সমব্যথী হবে, আপদে-বিপদে তাদের পাশে দাঁড়াবে, তাদের সাথে একাত্ম হয়ে যাবে।^২

বাংলাদেশের বেশির ভাগ ইসলামি দল ও তাদের আন্দোলন-সংগ্রাম শুধু আলেম-ওলামা এবং মাদরাসা পড়ুয়াদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কম সংখ্যক সাধারণ মানুষ এই দলগুলোর সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেছে। এটাই সত্য- জনপ্রিয়তা ইসলামি আন্দোলনের মূল বৈশিষ্ট্য হলেও বাংলাদেশের ইসলামি রাজনৈতিক দলগুলোর জনপ্রিয়তা বেশ তলানিতে। তারা অনেক বেশি জনবিচ্ছিন্ন। এ জনবিচ্ছিন্নতার কারণ কী? জনগণ তাদের গ্রহণ করেনি নাকি তারা জনগণের কাছে যাওয়ার চেষ্টা করেনি? এ দেশের বেশির ভাগ মানুষ ধার্মিক, নয়তো ইসলামের প্রতি দুর্বল। অন্যদিকে জনগণের বড়ো অংশটি ধর্মনিরপেক্ষতাবাদে বিশ্বাসী দল আওয়ামী লীগ এবং জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী দল বিএনপিতে বিভক্ত। এর বাইরে জনগণের যে ছোটো অংশটি রয়েছে; এরাই ইসলামপন্থী, বামপন্থী এবং অন্যান্য ধারার রাজনৈতিক দলে বিভক্ত। কেন জনগণের বড়ো অংশটি ইসলামি দল থেকে মুখ ফিরিয়ে? নিশ্চয়ই কোথাও সমস্যা রয়েছে। নিশ্চয়ই ইসলামি দলগুলো জনগণের কথা বলে না, জনস্বার্থে তাদের কর্মসূচি নেই। জনদুর্ভোগে, জনগণের কষ্টে, বিপদে-মুছিবতে, জনগণের প্রয়োজনে তাদের কাছে না দাঁড়িয়ে দোহাই দেয় ‘ইসলাম’ ‘ইসলাম’ বলে।

তাদের লক্ষ্য ও কর্মসূচি অনুযায়ী সবকিছুর ওপরে তারা শরিয়া আইনের বাস্তবায়ন দেখতে চায়, নিজেদের দলের স্বার্থের বিষয়টি দেখতে চায়। সাধারণ মানুষের কথা যেন বেমালুম ভুলে গিয়েছে। এ দেশের সাধারণ মানুষ চায় রাজনৈতিক দলগুলো ধর্মের চাইতে তাদের নিত্যদিনের সমস্যা ও সমাধান নিয়ে কথা বলুক। আর এই কারণে ইসলামি দলগুলো জনগণের পুরোপুরি আস্থা অর্জন করতে পারছে না। বদরুদ্দীন উমর লিখেন—

‘নির্বাচনী রাজনীতির ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির পরই গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে জামায়াতে ইসলামী ও জাতীয় পার্টি। জামায়াতে ইসলামী রাজনীতির মাঠ গরম করার ক্ষেত্রে জাতীয় পার্টির চেয়ে এগিয়ে থাকলেও ভোটের বাজারে জাতীয় পার্টির অবস্থান তাদের তুলনায় ভালো। নির্বাচনের ফলাফলের দিকে তাকালে দেখা যায় যে,

২. প্রফেসর ড. ইউসুফ আল কারজাভি, আধুনিক যুগ : ইসলাম কৌশল ও কর্মসূচি, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৬০

ধর্ম নিয়ে জামায়াতে ইসলামী ও তার সমগোত্রীয় দলগুলো যেভাবে রাজনৈতিক হইচই করে, তার তুলনায় জনগণের মধ্যে তাদের কোনো সমর্থন নেই।’^৩

হ্যাঁ, এ দেশের ইসলামপন্থীরা এবং অন্যান্য ধর্মের ধর্মপন্থীরা ধর্মীয় বিষয় নিয়ে যেভাবে সরগরম থাকে, জনগণ তথা মানুষের অধিকার নিয়ে তাদের সেই হইচই নেই। ‘মানুষ’ নয়; শুধুই ধর্মীয় ইস্যু আর নিজদের পন্থীদের নিয়ে যেন তাদের ভাবনা, সকল কর্মসূচি।

ইসলামপন্থী এবং অন্যান্য ধর্মপন্থীদের এরকম চরিত্রের বিষয়টি কাজী নজরুল ইসলামের ‘মানুষ’ কবিতায় সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। ‘মানুষ’ কবিতায় সাত দিন থেকে উপোস এক মুসাফিরের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। দেশ, কাল, জাতি, ধর্ম ও বর্ণের ওপর মানুষের মর্যাদা ও অধিকার সুরক্ষার বিষয়টি যে গুরুত্বপূর্ণ সে ভাব ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। আল্লাহর কাছে মানুষই যে সবার ওপরে সেটিও বলার চেষ্টা করা হয়েছে। কবি বোঝাতে চেয়েছেন, মানুষের চেয়ে বড়ো কিছু হতে পারে না, ধর্মও সে কথাই বলে। কিন্তু সে দিকে খেয়াল না করে মসজিদের মৌলভি আর মন্দিরের পুরোহিতরা অনেক সময় হৃদয়হীন কাজ করেন।

এক মুসাফির সাত দিন থেকে ক্ষুধার্ত। মন্দিরে গিয়ে পুরোহিতের কাছে খাবার চাইলে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হওয়ায় পুরোহিত মন্দিরের দরজা বন্ধ করে দেয়। মসজিদে শিরনির খাবার রয়ে গিয়েছিল। মুসাফির সেখানে যায় ক্ষুধা নিবারিতে। নামাজ না পড়ার কারণে ক্ষুধায় অস্থির মুসাফিরকে নামাজ পড়ার উপদেশ দিয়ে মসজিদের মৌলভি সাহেব খালি হাতে ফিরিয়ে দিলেন। বেনামাজি মুসাফিরের মনে ক্ষোভ জাগে পুরোহিত আর মৌলভি সাহেবের প্রতি। আল্লাহর অসীম দয়া ও মমতার কথা স্মরণে আসে। ৮০ বছর যাবৎ নামাজ-কালাম না করলেও আল্লাহর দয়া থেকে বঞ্চিত হয়নি— সে কথা মনে করে উদ্বেলিত হয়। ফিরে যাওয়ার কালে মুসাফির একদিকে তার নাফরমানী এবং অন্যদিকে আল্লাহর অসীম দয়ার কথা উচ্চারণ করে এই ভাবে—

‘আশিটা বছর কেটে গেল, আমি ডাকিনি তোমায় কভু,

আমার ক্ষুধার অন্ত তা বলে বন্ধ করনি প্রভু।’

ধর্ম, বর্ণ, পাপী-তাপী নির্বিশেষে মানুষের প্রতি আল্লাহর যে ভালবাসা অসীম— এটা ফুটে উঠেছে মুসাফিরের এই কথায়। মানুষের মর্যাদা আসলেই সবার ওপরে। কাজী নজরুল ইসলামের ‘মানুষ’ কবিতায় এর পূর্বের লাইনগুলো—

‘গাহি সাম্যের গান—

মানুষের চেয়ে বড়ো কিছু নাই, নহে কিছু মহিয়ান।

নাই দেশ-কাল-পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্মজাতি,

সব দেশে সব কালে ঘরে-ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি।

৩. বদরুদ্দীন উমর, বাংলাদেশের রাজনীতি, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৭৬

‘পূজারি দুয়ার খোলো,
 ক্ষুধার ঠাকুর দাঁড়ায়ে দুয়ারে পূজার সময় হলো!’
 স্বপন দেখিয়া আকুল পূজারি খুলিল ভজনালায়,
 দেবতার বরে আজ রাজা-টাজা হয়ে যাবে নিশ্চয়!
 জীর্ণ-বস্ত্র শীর্ণ-গাত্র, ক্ষুধায় কণ্ঠ ক্ষীণ
 ডাকিল পাশ্চ, ‘দ্বার খোল বাবা, খাইনি তো সাত দিন!’
 সহসা বন্ধ হলো মন্দির, ভুখারি ফিরিয়া চলে,
 তিমির রাত্রি, পথ জুড়ে তার ক্ষুধার মানিক জ্বলে!
 ভুখারি ফুকরি কয়,
 ‘ওই মন্দির পূজারির, হায় দেবতা, তোমার নয়!’
 মসজিদে কাল শিরনি আছিল,-অটেল গোস্তু রুটি
 বাঁচিয়া গিয়াছে, মোল্লা সাহেব হেসে তাই কুটি কুটি,
 এমন সময় এলো মুসাফির গায় আজারির চিন
 বলে, ‘বাবা, আমি ভুখা-ফাকা আজ নিয়ে সাত দিন!’
 তেরিয়া হইয়া হাকিল মোল্লা-‘ভালা হলো দেখি লেঠা,
 ভুখা আছ মর গো-ভাগাড়ে-গিয়ে! নামাজ পড়িস বেটা?’
 ভুখারি কহিল, ‘না বাবা!’ মোল্লা হাকিল-‘তাহলে শালা
 সোজা পথ দেখ!’ গোস্তু-রুটি নিয়া মসজিদে দিলো তালা!
 ভুখারি ফিরিয়া চলে,
 চলিতে চলিতে বলে-
 আশিটা বছর....’

বাংলাদেশের ইসলামি রাজনৈতিক দলগুলোর নেতা-কর্মীদের অবস্থা ‘মানুষ’ কবিতার পুরোহিত আর মৌলভি সাহেবের মতো। ইসলাম ধর্ম এবং নিজ দলের নেতা-কর্মীর বাইরে সাধারণ জনগণকে নিয়ে খুব একটা ভাবনা নেই, নেই কোনো কর্মসূচি। নিজ দলের বাইরের কেউ, এমনকী সমমনা অন্য ইসলামি দলের কাউকেও খুব একটা মূল্যায়ন করার বিষয়টি ইসলামি দলের নেতা-কর্মীদের মাঝে অনুপস্থিত।

ওই যে বলা হয়েছিল মূল বৈশিষ্ট্য ‘জনপ্রিয়তা’ সে জনপ্রিয়তার জন্য প্রয়োজন জনগণ। অন্য কথায় মানুষ। নিজ দলের কর্মীদের মাঝে ব্যাপক গ্রহণযোগ্য হওয়া, আর জনপ্রিয়তা এক বিষয় নয়। জনপ্রিয়তার সাথে সাধারণ জনগণের বিষয়টি সম্পৃক্ত। বাংলাদেশের বেশির ভাগ ইসলামি রাজনৈতিক দল জনপ্রিয় নয়; এসব দলের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কর্মসূচি জনবান্ধব নয়। দেখা গেছে সব ক’টি দলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে— শরিয়া আইন প্রতিষ্ঠা করা এবং এর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তোষ অর্জন। তাদের কর্মসূচিও শরিয়াভিত্তিক। সরাসরি জনগণের কথা নেই,

জনস্বার্থের কথা নেই। অবশ্য তারা বলে থাকে যে, ইসলামি শরিয়া প্রতিষ্ঠিত হলে জনগণের কল্যাণ সাধিত হবে, মানুষের সুখ ও শান্তি নিশ্চিত হবে। কিন্তু এ কথাগুলো দলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মধ্যে পৃথকভাবে উল্লেখ নেই। কর্মসূচির মধ্যে জনগণের বিষয়টি সব সময় উপেক্ষিত থাকে। শুধু ধর্মীয় কোনো ইস্যু তৈরি হলেই সরব হয়। ইসলাম সম্পর্কে কেউ কটুক্তি করলে ইসলামি দলগুলো বক্তৃতা-বিবৃতি আর মাঠের কর্মসূচিতে যেভাবে সক্রিয় হয়ে উঠে, সে সক্রিয়তা দেখা যায় না অন্য কোনো জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট ইস্যুতে। তেল-গ্যাসসহ নিত্যপণ্যের দাম বাড়ানো হলে বা দেশের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে কোনো কালো চুক্তি করলে এর প্রতিবাদে এগিয়ে আসে না ইসলামি দলগুলো। ইসলামি কোনো ইস্যু কিংবা নিজ দলের নেতা-কর্মীর জন্য হরতাল দিলেও জনস্বার্থে কোনো হরতাল তারা দেয় না। জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট কিছু কিছু ইস্যুতে কিছু বিক্ষোভ কর্মসূচি কদাচিৎ পালন করলেও জনগণ এটাকে কেবল সরকারবিরোধী কর্মসূচি হিসেবেই দেখে। নাগরিক কোনো সমস্যা বা দেশবিরোধী কোনো চুক্তি হলে এর বিরুদ্ধে দাঁড়ানো কি ইসলামি দলগুলোর কার্যপরিধিতে পড়ে না? ইউসুফ আল কারজাভি যেমনটি বলছেন—

‘ইসলামি আন্দোলন মুসলিম জনগণের কাছে ইসলামি শ্লোগান ও সমস্যার সমাধান সংবলিত উক্তি প্রচারের ক্ষেত্রে যে ভুল করছে তা সংশোধন করতে হবে। যখন শ্লোগানে বলা হয় “ইসলাম-ই সমাধান”, “ইসলাম ছাড়া কোনো আশা নেই” অথবা “আমাদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যার একমাত্র সমাধান ইসলাম”— তখন সাধারণ মানুষ মনে করে, এসব শ্লোগানে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে নির্বাচনে তাদের প্রার্থীদের সমর্থন দিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে পার্লামেন্টে পাঠালেই জাদুর কাঠির স্পর্শে বা আলৌকিকভাবে তাদের সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। ইসলামি আন্দোলনকারী ও আন্দোলনের বুদ্ধিজীবীদের সরাসরি ও সহজভাবে জনগণকে বোঝাতে হবে যে, ইসলাম জনগণের মাধ্যমেই জনগণেরই সমস্যার সমাধান চায়। ...সুন্দর জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজন ন্যায্যপরায়ণ সমাজ। যে সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য জনগণকেই কাজ করতে হবে।’^৪

আব্বাহ কুরআন মুসলিম জনগোষ্ঠীর জন্য নাজিল করেননি। নাজিল করা হয়েছে মানুষ ও মানবতার জন্য। কুরআনের মূল বিষয়বস্তু মানুষ অর্থাৎ জনগণ। বাংলাদেশের ইসলামি রাজনৈতিক দলগুলো সেই জনগণের দলে পরিণত হতে পারেনি। অবশ্য বেশির ভাগ ইসলামি দল নিজদের জনগণের দল হিসেবে দাবি করে। কিন্তু জনগণের কাছে এখনও ভালোভাবে পৌঁছতে পারেনি। মিসরসহ অন্যান্য দেশের ইসলামি রাজনৈতিক দলগুলোর অবস্থা প্রায় একই রকম। এক শতাব্দীর বেশি সময় ধরে রাজনীতিতে সক্রিয় থেকেও ইখওয়ানুল মুসলিমিন রাষ্ট্রক্ষমতায় এসেছিল এক বিশেষ প্রেক্ষাপটে। আরব বসন্তের পর সেই ক্ষণস্থায়ী ক্ষমতায় আসতে হয়েছিল তাও আবার নতুন নামে আবির্ভূত হয়ে অন্যদের সহযোগিতা নিয়ে। পাকিস্তানে জামায়াতে ইসলামী এককভাবে দাঁড়িয়ে কয়টা সিট পায়? বাংলাদেশের জামায়াতে ইসলামী থেকে জনপ্রিয়তার দিক থেকে তারা আরও পিছিয়ে।

৪. প্রফেসর ড. ইউসুফ আল কারজাভি, আধুনিক যুগ : ইসলাম কৌশল ও কর্মসূচি, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৬০

মজলিসে মুত্তাহিদা আমেলা বা অন্যান্য ইসলামি দলের সাথে জোট করে একবার পাকিস্তানের জামায়াতে ইসলামীসহ ইসলামপন্থীরা একটা প্রদেশের সরকার প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিল।^৫

কুরআন ও হাদিসে রাষ্ট্র ব্যবস্থায় যে কার্যাবলির নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে তা সবই জনকল্যাণের সাথে সম্পৃক্ত। মানুষকে ঘিরেই এই রাষ্ট্র গঠিত হয়। মানুষ সমাজবদ্ধ জীবনযাপন করে এবং রাষ্ট্র হচ্ছে সমাজ পরিচালনার সাংগঠনিক কাঠামো। রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার অন্যতম মূল কাজ হচ্ছে তার নাগরিকদের অধিকার নিশ্চিত করা। মানুষের মৌলিক অধিকার খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ইত্যাদি নিশ্চিত করা। এগুলো জনগণের কর্মসূচি, মানুষের কর্মসূচি। এসব মৌলিক অধিকার নিশ্চিত না করে তো আর শরিয়া আইন প্রতিষ্ঠা করা যায় না। কারণ, একটা মানুষকে বাঁচার জন্য আগে প্রয়োজন তার মৌলিক অধিকার। অথচ আমাদের দেশের ইসলামি দলগুলো সবকিছুর আগেই ইসলামি শরিয়া বাস্তবায়ন করতে চায়। অথচ শরিয়া আইনও কিন্তু মৌলিক অধিকার নিশ্চিতের কথা বলে। ইসলামি রাষ্ট্রের ওপর জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকটি নাগরিকের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা এসব মৌলিক চাহিদা পূরণের ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। হজরত উমর (রা.) তাই তো বলেছিলেন, ‘ফোরাতের তীরে একটা কুকুর মারা গেলেও তার জন্য আমাকে দায়ী থাকতে হবে।’ এখানে দেখা যাচ্ছে শুধু মানুষ নয়; রাষ্ট্রে বা জমিনে বিচরণকারী সকল জীব-জন্তুকেও ভালবাসতে হবে ইসলামি রাজনীতির মিশন-ভিশন বাস্তবায়নের জন্য।

তুরস্কসহ বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দল নির্বাচনের রাজনীতিতে ভালো করছে। এসব দলের কর্মসূচি, নির্বাচনী ইশতেহার পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তারা জনগণের চাহিদা ও সমস্যাতে গুরুত্ব দিচ্ছে। ধর্মীয় অ্যাগেন্ডার চেয়ে আর্থ-সামাজিক অ্যাগেন্ডাকে প্রাধান্য দিচ্ছে। জনগণের বিরাজমান সমস্যাতে অগ্রাধিকার না দিয়ে শুধু ধর্মীয় অ্যাগেন্ডাকে প্রাধান্য দিয়ে নির্বাচনে ভালো করার সম্ভাবনা থাকে না। যারা কেবলই ধর্মীয় বিষয়গুলোকে অগ্রাধিকার দিয়ে আন্দোলন করছে তারা নির্বাচনের ফলাফল বিবেচনায় প্রান্তিক অবস্থান থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি। বাংলাদেশের মতো দেশে ধর্মীয় বিষয় নির্বাচনের রাজনীতিতে ভোটের ক্ষেত্রে কাজে লাগলেও সামগ্রিকভাবে কেবল ধর্মীয় অ্যাগেন্ডাই নির্বাচনের রাজনীতিতে সফলতার পথ দেখাতে পারে না। মানুষ যেহেতু ধর্মের প্রতি দুর্বল, ধর্মীয় অ্যাগেন্ডা নিয়ে রাজনীতি করলে প্রেসার গ্রুপের ভূমিকায় কিংবা ভোটের রাজনীতিতে ফ্যাক্টর-এর ভূমিকায় আসা যাবে, কিন্তু রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসার ম্যান্ডেট পাওয়া যাবে না।

^৫ মুত্তাহিদা মজলিস-ই-আমল, পাকিস্তানের বিভিন্ন ইসলামি রাজনৈতিক দলের জোটের নাম। এ জোটের শরিক দল ছিল—জমিয়তে ওলামায়ে পাকিস্তান, জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম (মাওলানা ফজলুর রহমান গ্রুপ), জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম (সামিউল হক গ্রুপ), জামায়াতে ইসলামী, তেহরিক-ই-জাফরিয়া পাকিস্তান এবং জমিয়তে আহলে হাদিস। গঠিত হওয়ার পর এ জোট ২০০২ সালে পাকিস্তানের নির্বাচনে অংশ নেয়। তারা খায়বার-পাখতুনখায় প্রাদেশিক সরকার গঠন করে। ২০০৫ সালে জোটটি ভেঙে যায়। ২০০৮ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে এ ঘোষণা দেওয়া হয়।

হেফাজতে ইসলাম একটি প্রেসার গ্রুপ হওয়ার কারণে তাদের একটি প্রধান দাবি- কওমি মাদ্রাসার সর্বোচ্চ সনদের স্বীকৃতি মাস্টার্স সমমান দিয়ে আওয়ামী লীগ তাদেরকে কাছে টানার চেষ্টা করেছে। প্রেসার গ্রুপ কিংবা ভোটের রাজনীতিতে ফ্যাক্টর হলে এটাই হবে, কিন্তু চূড়ান্ত সফলতা আসবে না। চূড়ান্ত সফলতার জন্য নিজদেরকে জনগণের কথা বলতে হবে। আর্থ-সামাজিক বিষয়ে দলের ঘোষণাপত্র, কর্মসূচি ও ইশতেহার সাজাতে হবে। আপনি বলবেন, ক্ষমতায় গেলে ইসলাম কয়েম করবেন, আর ওনারা বলবে ক্ষমতায় গেলে ১০ টাকায় চাল খাওয়াবে। মানুষ ১০ টাকায় চাল খেয়ে আগে বাঁচতে চায়, তারপর ইসলাম পালনের চিন্তা। অতএব, ১০ টাকায় চাল খাওয়ানোর স্বপ্ন যে দেখাবে তাকেই মানুষ ভোট দেবে। ওনারা ক্ষমতায় গিয়ে পরে হয়তো কথা-ই রাখল না; কিন্তু স্বপ্ন তো দেখাতে পেরেছে। শেরে বাংলা একে ফজলুল হক অনেক বড়ো নেতা ছিলেন। বাংলার মুসলিমদের কাছে অনেক বেশি জনপ্রিয় ছিলেন। এই জনপ্রিয়তার মূলে ছিল তাঁর ক্যারিশমেটিক নেতৃত্ব, জ্ঞান, প্রজ্ঞার পাশাপাশি জনবান্ধব চরিত্র ও কর্মসূচি। সে সময়ের মধ্যবিত্ত শ্রেণির মুসলিমরা তাঁকে গভীরভাবে ভালোবাসতো, শ্রদ্ধা করত; কারণ তিনি তাদের জন্য চাকরির ব্যবস্থা করেন, স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাদের জন্য বিভিন্ন সুযোগ-সুবিদার ব্যবস্থা করেন।^৬ ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে শেরে বাংলা ফজলুল হকের বিপুল জনপ্রিয়তা কৃষক প্রজা পার্টির মূলধনস্বরূপ ছিল। তার মতো এত জনপ্রিয় আর কেউ ছিল না। ফজলুল হক গরিব প্রজাদের ডাল-ভাতের নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন। আর অন্যদিকে মুসলিম লীগ ছিল জমিদার ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের অভিজাত শ্রেণির প্রতিষ্ঠান।^৭

তুলনামূলকভাবে ইসলামি রাজনৈতিক দলগুলোর নেতা-কর্মীর থেকে প্রচলিত রাজনৈতিক দলগুলোর নেতা-কর্মীদের চরিত্র গণমুখী। হয়তো অনেকে গণ-বিরোধী কাজ করছে, তার কাজের ফলাফল জনগণের বিরুদ্ধেও যাচ্ছে, কিন্তু সে এমনভাবে আচরণ করছে যে মনে হয় সে জনগণের জন্যই কাজ করছে। জনগণকে বলছে যে, সে তাদের জন্যই এ কাজ বা কর্মসূচি পালন করছে। দেশবিরোধী চুক্তি ও প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে অন্যের স্বার্থে; কিন্তু বলছে এটা জনগণের জন্য। অর্থাৎ তার মধ্যে ভেতরগত দিক থেকে না হলেও বাহ্যিকভাবে জনবান্ধব চরিত্রের উপস্থিতি রয়েছে। যদিও এটা প্রতারণা। অবশ্য, ইসলামপন্থীরা এমন প্রতারণার আশ্রয় নিতে পারে না। কিন্তু প্রতারণার আশ্রয় না নিয়ে কি জনবান্ধব চরিত্র হয় না? অনেকের ভেতরে ও বাইরে জনবান্ধব চরিত্রের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ইসলামপন্থীদের একটু আলাদা-ই মনে হয়। একটি সরকারি হাসপাতালের জরুরি বিভাগের এক ডাক্তারের অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করা যেতে পারে।

^৬ জয়া চ্যাটার্জী, *বাঙলা ভাগ হলো : হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা ও দেশ বিভাগ*, আবু জাফর অনূদিত, (ঢাকা : দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০১৩), পৃষ্ঠা-৮০

^৭ Harun-or-Rashid, *Foreshadowing of Bangladesh*, (Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 1987) p, 74

ডাক্তার সাহেবের ভাষ্য অনুযায়ী, তাদের সাথে অনেক পাক্কা নামাজি কিংবা তাবলীগি ডাক্তার কলিগ আছেন। দেখা যায়, একজন ইমার্জেন্সি রোগী সামনে। অন্যদিকে নামাজের সময় হয়ে গেছে কিংবা মসজিদে নামাজের জামায়াত দাঁড়ানোর সময় হয়েছে। দেখা যাবে ওই পাক্কা নামাজি ডাক্তার ওই ইমার্জেন্সি রোগী ফেলে নামাজে চলে গেছেন। ডাক্তারের এই ইমার্জেন্সি মুহূর্তে সার্ভিস দেওয়ার অভাবে হয়তো সে রোগীর মারাত্মক ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে নামাজ আরেকটু দেরি পড়ার সময়ও আছে। প্রশ্ন হচ্ছে নামাজ বড়ো না রোগী বড়ো? অন্য কথায় নামাজ বড়ো না মানুষ বড়ো? নিশ্চয়ই ওই ডাক্তারের জবাব হবে নামাজ বড়ো। মানুষের চাইতে নামাজ যদি বড়ো-ই হয়ে থাকে, নামাজের প্রয়োজনে ওই মানুষকে বাঁচানো জরুরি। কারণ, আপনি ডাক্তার সাহেবের এক ওয়াক্ত নামাজ জামায়াতে পড়তে গিয়ে একটা মানুষ মারা গেল। কিন্তু মানুষটি বাঁচলে সে জীবনে হয়তো হাজার হাজার ওয়াক্ত নামাজ আদায় করত, আল্লাহর আরও বিভিন্ন ইবাদাত-বন্দেগি করার সুযোগ পেত। ইসলামপন্থীদের অনেকের মাঝে এই বোধটুকুর অভাব অনেক বেশি। মানুষের প্রতি ভালবাসা অনেক বেশি প্রয়োজন। একজন ইসলামপন্থী বিশেষ করে ইসলামি রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীর মধ্যে জনবান্ধব চরিত্রের উপস্থিতি একটু বেশিই প্রয়োজন তার আদর্শ, মিশন বাস্তবায়নের প্রয়োজনে। আপনি যতই নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হোন না কেন-যতক্ষণ না আপনি মানুষের কাছে যাবেন ততক্ষণ আপনি সফল হতে পারবেন না। জনবান্ধব চরিত্র যারই থাকবে, রাজনৈতিক হিসাব-নিকাশে সে-ই বেশি সফল হবে; হোক না সে বেনামাজি।

রাজনৈতিক কার্যক্রমসহ যেকোনো কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে পরিবার-পরিজন, পাড়া-প্রতিবেশীর একটা ভূমিকা থাকে। তাদের সহযোগিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেখা যায়, বাংলাদেশের ইসলামপন্থীরা এদিক থেকেও অনেক পিছিয়ে। হজরত খাদিজা (রা.)-এর সেই হাদিসে রাসূলুল্লাহ (সা.) যে তাঁর আত্মীয়স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষা করে চলতেন সে কথা দৃঢ়তার সাথে বলা হয়েছে। আত্মীয়তার বন্ধন সংরক্ষণ করা এবং অতিথির সেবা করা- এই দুটো কারণও খাদিজা (রা.)-এর আস্থার কারণ যে, আল্লাহ নবিকে ধ্বংস করবেন না; বরং সম্মানিত করবেন।

হজরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর নবুওতি জীবনে নিজ বংশ কুরাইশদের কাছ থেকে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছেন বেশি- এটা সত্য। কিন্তু এই নিজ বংশ এবং আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে বেশি সহযোগিতাও পেয়েছেন। স্ত্রী হজরত খাদিজা (রা.) সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করে মনোবল বাড়িয়েছেন। চাচাতো ভাই হজরত আলি (রা.) ছোটোদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মিশনকে আরেক ধাপ এগিয়ে নিয়েছেন। চাচা হজরত হামজা (রা.) ইসলাম গ্রহণ করে পাশে দাঁড়িয়েছেন। ইসলামের ইতিহাসে বীরযোদ্ধা হিসেবে পরিচিতি পেয়েছেন এই চাচা হামজা (রা.)। এক আবু লাহাব ছাড়া অন্য চাচার নবিজির সাথে অত্যন্ত মধুর সম্পর্ক রাখতেন। আবু তালিব যদিও ঈমান আনেননি; নবিজির জন্য সর্বস্ব দিয়ে সাহায্য করেছেন। তিন বছর শিয়াবে আবু তালিবে বন্দি অবস্থায় ছিলেন এই চাচাও। বিরোধীশক্তি আল্লাহর নবির বিরুদ্ধে অনেক বেশি ষড়যন্ত্র করলেও আবু তালিবের জীবদ্দশায় হত্যার মতো পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারেনি।

কারণ, তিনি ছিলেন এ ক্ষেত্রে বড়ো অন্তরায়। রাসূলের চাচা হামজার ছোটো ভাই আব্বাস অমুসলিম থাকাবস্থায় রাসূলকে সহযোগিতা করেছেন। এ তো গেল আত্মীয়স্বজন কর্তৃক রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দাওয়াতি মিশনের সহযোগিতা। অন্যদিকে, রাসূলুল্লাহ (সা.)ও পরিবার-পরিজনের পাশে দাঁড়িয়েছেন। সহযোগিতা করেছেন উদারভাবে। চাচা আবু তালিবের আর্থিক কষ্ট লাঘব করতে চাচাতো ভাই আলির দায়িত্ব ছোটো থেকেই গ্রহণ করেছেন। আবু তালিব এবং খাদিজার মৃত্যুর পর হজরতের জীবনে দুর্দিন আরও ঘনিভূত হয়। তাদের মৃত্যুর পরই নবিজিকে হত্যার পরিকল্পনা করা হয় এবং শেষ পর্যন্ত তাঁকে হিজরত করে মক্কা ছাড়তে হয়। দেখা যাচ্ছে, আল্লাহর রাসূলের মিশন বাস্তবায়নের পথে নিজ পরিজনের লোক তাঁকে সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহর রাসূল নিজ আত্মীয়স্বজনের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন। প্রতিবেশীদের সাথে সুসম্পর্ক ও যোগাযোগ রক্ষা করতেন নিয়মিত। ফলে তারা নবিকে ভালবেসেছিল অকাতরে। শুধু নবি হিসেবে নয়, শুধু আত্মীয় হিসেবে নয়; একজন সুপ্রতিবেশী হিসেবে, একজন ভালো স্বজন হিসেবে তারা তাঁকে ভালবেসেছে। ইসলাম গ্রহণ না করেও অনেকে নবির পাশে দাঁড়িয়েছে।

বাংলাদেশের ইসলামপন্থীদের ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে, যে যত বড়ো নেতা সে তত বেশি পরিবার-পরিজন, পাড়া-প্রতিবেশীদের থেকে বিচ্ছিন্ন। আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীদের সাথে ইসলামপন্থীদের সম্পর্ক তুলনামূলক অন্যদের চাইতে একটু কমই হয়। ক্যাডারভিত্তিক ইসলামি দলগুলোর দলীয় কর্মসূচি এমনভাবে সাজানো হয় যে, ইচ্ছা করলেও একজন নেতা বা কর্মী পরিজনের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে চলতে পারে না। আত্মীয়স্বজন একটা ফ্যাক্টর হতে পারে একজন রাজনৈতিক নেতা কিংবা কর্মীর রাজনৈতিক মিশন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে। রাজনীতিতে সংঘাত-সংঘর্ষের মুখোমুখি হতে হয় কখনো কখনো। এ ক্ষেত্রে আত্মীয়স্বজন রাজনীতির উর্ধ্বে উঠে তার রাজনীতিক স্বজনের পক্ষে এগিয়ে আসতে পারে যদি সেভাবে যোগাযোগ থাকে। নির্বাচন রাজনীতির একটা বিষয়। বর্তমান সময়ে ইসলামি রাজনীতির লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নির্বাচন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দলের পক্ষে নির্বাচন করে থাকেন ব্যক্তি। দলীয় পরিচয় নিয়ে ব্যক্তি দলের প্রতিনিধিত্ব করে থাকেন। ওই ব্যক্তির ব্যক্তি ইমেজ এবং সামাজিক নেটওয়ার্ক খুবই গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনে বিজয়ে ক্ষেত্রে। এ ক্ষেত্রে আত্মীয়স্বজন, সমাজের লোকজন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। দলীয় পরিচয় ভুলে নিজের ওই স্বজনের পক্ষে মাঠে নামতে পারেন কিংবা নিজের ওই স্বজনের জন্য ওই দলের সমর্থকও হয়ে যেতে পারেন। ওই ব্যক্তির গ্রহণযোগ্যতার কারণে সমাজের মানুষ তাকে গ্রহণ করে যা প্রকারান্ত্রে দলের জন্য লাভের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু বাংলাদেশের ইসলামপন্থীরা এ ক্ষেত্রে অনেক ব্যর্থ-ই বলা যায়। তাদের চরিত্রে পরিজন-প্রতিবেশির সাথে সুসম্পর্ক রাখার বিষয়টি কমই লক্ষ্য করা যায়। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক-

ধরণ, ‘ক’ একটি ইসলামি রাজনৈতিক দলের কর্মী। ‘খ’ বুর্জোয়া কোনো রাজনৈতিক দলের কর্মী। তারা দুজন চাচাতো ভাই। দুজনের-ই পিতা বেঁচে নেই। আছেন একজন চাচা। নাম ‘গ’। ‘ক’ নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে, কারও সাথে অন্যায় আচরণ করে না,

কোনো প্রতারণামূলক কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়, পাড়া-প্রতিবেশি কিংবা অন্য কারও সাথে দুর্ব্যবহার করে না। অন্যদিকে, ‘খ’ খুব একটা নামাজ পড়ে না, দুর্নীতির সাথে কিছুটা জড়িত, অসৎ পন্থায় কিছুটা সম্পদও বানিয়েছে। চাচা ‘গ’ প্রায় সময়ই ‘খ’-কে বকাবকি করেন। নিয়মিত নামাজ পড়ার তাগিদ দেন। দুর্নীতি না করার কথা বলেন। তারপরও চাচা ভাতিজা ‘ক’-এর চাইতে ‘খ’-কে পছন্দ করেন বেশি। ‘খ’-কে বকাবকি করেন বেশি, আবার আদরও করেন বেশি। একদিন চাচাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, তুলনামূলক ভালো চারিত্রিক হওয়া সত্ত্বেও আপনি ‘ক’-এর চাইতে ‘খ’-কে বেশি ভালোবাসেন কেন? চাচা ‘গ’-এর জবাব ছিল- ‘ক’ নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হলেও তার ওপর নির্ভর করা যায় না। বিপদ-মুহিবতে ‘খ’-এর ওপরই নির্ভর করা যাবে।

একবার চাচা ‘গ’ অসুস্থ হয়ে পড়েন। ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়ার মতো আছে কেবল ‘ক’ ও ‘খ’। একই সময়ে ‘ক’-এর দলের এক নেতা অসুস্থ। ‘ক’ সেই নেতাকে নিয়ে ব্যস্ত। চাচা ‘গ’-এর সেবা-যত্ন করার সময়ই পাচ্ছে না সে। অবশ্য মাঝেমধ্যে চাচার খোঁজ-খবর নেয় এবং নামাজান্তে চাচার সুস্থতার জন্য দুআও করে। এদিকে এই সময়ে ‘খ’-এর নেতা রাজধানী থেকে এলাকায় এসেছেন, থাকবেনও কয়েক দিন। ‘খ’ও তাই ব্যস্ত নেতাকে নিয়ে। কিন্তু চাচার অসুস্থতার বিষয়টিও তাঁকে ভাবিয়ে তুলল। সে চাচাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেল। ডাক্তার হাসপাতালে ভর্তি করার কথা বললে ‘খ’ হাসপাতালে ভর্তি করার ব্যবস্থা করল।

‘গ’ হাসপাতালে মৃত্যুর প্রহর গুণছেন। ‘খ’ চাচার সেবা-শুশ্রূষা করে এবং ফাঁক দিয়ে নেতাকেও সময় দেয়। যখন নেতার কাছে যায় ‘খ’ তখন কাউকে চাচার কাছে রেখে যায়, নেতার আশীর্বাদ নিয়ে আবার ফিরে আসে। একদিন নেতাকে চাচার শয্যাপাশে নিয়ে আসে। নেতা যে ‘খ’-এর চাচাকে দেখতে এসেছেন- পরদিন পত্রিকায় ছবিও ছাপা হয়। কয়েকদিন অসুস্থ থাকার পর ‘গ’ মারা গেলেন। মারা যাওয়ার পর ‘খ’-এর ব্যস্ততা বেড়ে যায়। সে চাচার শ্বশুরকুলের লোকজনসহ আত্মীয়স্বজন সবাইকে মৃত্যুর সংবাদ জানানোর ব্যবস্থা করে। কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করে। নিজে খুব একটা টুপি পরে না। এই দিন টুপি পরে চাচার জানাজায় অংশগ্রহণ করে। ‘গ’-এর শ্বশুর বাড়ি এবং অন্যান্য যারা সবাই ‘খ’-এর মাধ্যমে খবর পেলেন। তারা তার ব্যতিব্যস্ততা দেখলেন। সবাই ‘খ’-এর প্রশংসা করে। এই সময়ের এই ভূমিকা কেউ ভুলতে পারে না। অন্যদিকে, চাচার মৃত্যুর সময় ‘ক’ তার নেতার শয্যাপাশে। মৃত্যু সংবাদ শুনে ‘ক’ বাড়িতে আসে এবং কাফন-দাফনে অংশ নেয়। চাচার জানাজার নামাজে ইমামতিও করে। দেখা গেলো, ‘খ’ তার সব আত্মীয়স্বজন ও এলাকাবাসীর কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠল। অন্যদিকে, ‘ক’-কে সবাই ভালো জানলেও সবাই ‘খ’-এর সাথে যোগাযোগ রাখে।

ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে ‘ক’ তার দল থেকে মনোনয়ন পায়। সে নির্বাচনে ফেল করে। আর একবার ‘খ’-কে তার দল মনোনয়ন দেয়। ‘ক’ নির্বাচিত হলে দুর্নীতি করবে না, সরকারের বরাদ্দ ঠিকমতো বণ্টন হবে— এটা সত্য। কিন্তু পাশ করেনি। পরেরবার একই পরিবারের, তারপরও ‘খ’-কে মানুষ ভোট দিলো। কারণ, ‘খ’ এলাকায় বেশি জনপ্রিয়। লোকজন তাকে কাছে পায়। দুর্নীতি করলেও লোকজনের উপকারে কাজে লাগবে। নির্বাচিত হওয়ার পর সরকারি বরাদ্দের বেশির ভাগ টাকা আত্মসাৎ করে ফেলে ‘খ’ চেয়ারম্যান। আত্মসাৎকৃত টাকার একটা অংশ দিয়ে মাঝে মাঝে দুঃস্থ-অসহায় মানুষকে দান করে। তারপরও ‘খ’ মানুষের কাছে জনপ্রিয়। কারণ, পাড়া-প্রতিবেশী ও সমাজের মানুষের সাথে ‘খ’ বেশি মেশে। নির্বাচনের রাজনীতিতে ‘ক’-এর চাইতে ‘খ’ অনেক এগিয়ে। বিপদ-মুহিবতে ‘ক’-এর চাইতে ‘খ’ কে-ই মানুষ পায় বেশি। মূলত জনগণ দুর্নীতিকে ঘৃণা করে ঠিকই; কিন্তু তারা তাদের কাছের মানুষকে জনপ্রতিনিধি হিসেবে দেখতে চায়। এই গুণ যদি ‘ক’-এর মধ্যে থাকত; তাহলে ‘খ’ নির্বাচন করার চিন্তা-ই করতে পারত না।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ইসলামি রাজনৈতিক দলের বেশির ভাগ নেতা-কর্মীর চরিত্র ‘ক’-এর মতো। কিছু কিছু ইসলামপন্থী আছে যাদের চরিত্র স্বতন্ত্র। তাদের মাঝে রয়েছে সামাজিক গুণ। সমাজের মানুষের সাথে মেশার গুণ। কল্যাণে-অকল্যাণে কাছে যাওয়ার গুণ। এসব ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে দেখা যায়, তাদের নিজদের দলকে গ্রহণ না করলেও এসব ব্যক্তিকে সমাজের মানুষ গ্রহণ করে। ভোট দিয়ে নির্বাচিত করে। ইসলামি দলের এরকম জনপ্রিয় লোকজন আবার তাদের দলে থাকেন কোণঠাসা। যেমন, একটি ইসলামি দলের এক নেতা, পরপর দুবার উপজেলা চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন। ওই চেয়ারম্যানের জেলায় তার চাইতে আরও বড়ো নেতা রয়েছেন। সেসব বড়ো বড়ো নেতার চাইতে জনগণের কাছে জনপ্রিয় এই উপজেলা চেয়ারম্যান। দলের প্রতিকূল সময়ে ২০০৯ সালে এবং ২০১৪ সালে পরপর দুইবার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। এলাকা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, দেশের অপরাপর উপজেলার চাইতে এ উপজেলায় ওই ইসলামি দলের অবস্থান তুলনামূলক দুর্বল। কিন্তু ওই নেতা ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তার বলে, সমাজের মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতার বলে এবং এলাকার বিভিন্ন প্রভাবশালী বংশে আত্মীয়তা থাকায় প্রতিকূল সময়েও চেয়ারম্যান নির্বাচিত হচ্ছেন। আরও বিভিন্ন জায়গায় যেখানে ইসলামপন্থীদের নির্বাচনে বিজয় দেখা গেছে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা গেছে দলের চাইতে প্রার্থীর নিজের যোগ্যতা এবং সমাজের মানুষের কাছে ব্যক্তিগত গ্রহণযোগ্যতা বিজয়ের ক্ষেত্রে মূল ফ্যাক্টর ছিল।

আর্থ-সামাজিক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের কমতি

নবুওত প্রাপ্তির পর খাদিজা (সা.)-এর সাক্ষ্যনা সংবলিত সেই হাদিসে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জনকল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণের বিষয়টি উঠে এসেছে। কিশোর বয়সে হিলফুল ফুজুল গঠন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সামাজিক কর্মসূচি, জনকল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণের জ্বলন্ত দলিল।

সামাজিক কর্মসূচিতে বাংলাদেশের ইসলামপন্থীদের উপস্থিতি কম-ই পরিলক্ষিত হয়। অনেক ইসলামপন্থী কিংবা ধার্মিক লোক আছেন যারা তাদের সামনে বিপদ দেখলেও সেই বিপদ থেকে উদ্ধারের চিন্তা না করে ইসলামের বিধিবিধান পালনকেই বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকেন।

পৃথিবীর কোথাও কোথাও রাজনৈতিক আন্দোলনের চেয়ে সামাজিক আন্দোলনের প্রভাব বেশি দেখা যায়। যেমন ইন্দোনেশিয়াতে মোহাম্মদিয়া, দেওয়ান দাওয়াহ, নাহদাতুল উলামা প্রভৃতি সংগঠন রাজনৈতিক সংগঠন করার আগে ১৯৪৫ সালে স্বাধীনতা লাভের পর সামাজিক ও দাওয়াহ কার্যক্রম পরিচালনা করে ব্যাপক গণভিত্তি রচনা করে। এর ফলে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যারাই আসীন হোক না কেন তাদের প্রভাব থাকে। এ থেকে পরিষ্কার যে, রাজনৈতিকভাবে মাঠে নেমে ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বী না হয়ে যারাই ক্ষমতায় যাক তাদের ওপর প্রভাব এবং নিয়ন্ত্রণ রেখে অনেক টার্গেট হাসিল করা যায়। তুরস্কের গুলেন মুভমেন্ট এবং ইন্দোনেশিয়াতে মোহাম্মদিয়াকে State within the state বলা হয়।

ব্যক্তিগতভাবে সামাজিক কিংবা জনকল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণের পাশাপাশি সাংগঠনিকভাবে বাংলাদেশে সামাজিক কর্মসূচি পালন করার মতো বহু বিষয় রয়েছে। বাংলাদেশের ইসলামি দলগুলো এ ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে। প্রচলিত ধারার রাজনৈতিক দলগুলোরও অবশ্য সামাজিক কার্যক্রমে সম্পৃক্ততা কম। নেতা নির্বাচন করে সমাজের মানুষ। নেতাই তো রাজনীতি পরিচালনা করবেন। নিজ দলের রাজনীতি নয়; রাষ্ট্রীয় রাজনীতি। এ নেতা নির্বাচিত হন তিনি যিনি সামাজিক কর্মকাণ্ডে থাকেন অনেক বেশি সম্পৃক্ত। এটা ব্যক্তিগতভাবে সামাজিক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের দিক। আবার সাংগঠনিকভাবে, সংস্থা-সমিতি এবং অন্য আরও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে সামাজিক কর্মসূচি পালন করা যায়। গড়ে তোলা যায় সামাজিক আন্দোলন।

বাংলাদেশে অনেক এনজিও সামাজিক কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছে। তারা আর্থিকভাবে এবং সামাজিকভাবে লাভমানও হচ্ছে। দেখা যায়, যারা এসব সামাজিক কাজে জড়িত তারা ইসলামি দলগুলোর সমর্থক নন। অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইউনুস গড়ে তুলেছেন গ্রামীণ ব্যাংক। তার এই গ্রামীণ ব্যাংকের মাধ্যমে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হয়। সারাদেশে রয়েছে গ্রামীণ ব্যাংকের নেটওয়ার্ক। এই গ্রামীণ ব্যাংক নোবেল পুরস্কারও পায়। ইসলামপন্থীরা গুরুত্ব দিকে এর বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। ফলে অনেক জায়গায় গ্রামীণ ব্যাংক শাখা খুলতে পারেনি। কার্যক্রম চালাতে পারেনি। ইসলামপন্থীদের যুক্তি ছিল, গ্রামীণ ব্যাংক একটি সুদি প্রতিষ্ঠান। এর কার্যক্রম অনৈইসলামিক। কিন্তু ঠিকই আস্তে আস্তে গ্রামীণ ব্যাংক সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে। যেসব এলাকার ইসলামপন্থীরা বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, সেসব এলাকার সেই ইসলামপন্থীদের অনেক আত্মীয়স্বজনই এখন গ্রামীণ ব্যাংকের গ্রাহক। কারণ, ইসলামপন্থীরা গ্রামীণ ব্যাংকের বিরোধিতা করলেও মানুষের জন্য ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্প নিয়ে এগিয়ে আসেনি। মানুষ ক্ষুদ্র বিনিয়োগ নিতে তার প্রয়োজনে গ্রামীণ ব্যাংকের কাছে এসেছে। ড. ইউনুস এই সামাজিক কর্মসূচির মাধ্যমে অনেক ব্যবসা করেছেন। আন্তর্জাতিক খ্যাতিও অর্জন করেছেন। সর্বোচ্চ আন্তর্জাতিক পুরস্কার নোবেল লাভ করেছেন।

গ্রামীণ ব্যাংকের পর এসব কার্যক্রম নিয়ে জনগণের সামনে আসে ব্র্যাক, আশা প্রভৃতি সংস্থা। এগুলোর ধারক-বাহকরা কেউই ইসলামপন্থী নন। অবশ্য ইসলামী ব্যাংক আরডিএস প্রকল্পের মাধ্যমে ক্ষুদ্র বিনিয়োগ কার্যক্রম শুরু করে। এটা ইসলামপন্থীদের দ্বারা হয়েছে ঠিকই। কিন্তু বহু পরে। ইসলামপন্থীরা গ্রামীণ ব্যাংকের বিরোধিতা করে যদি আরডিএস-এর মতো সুদমুক্ত কোনো প্রকল্প নিয়ে জনগণের কাছে হাজির হতো তাহলে তাদের সেই বিরোধিতা অনেক বেশি কার্যকর হতো। শুধু হালাল-হারামের দোহাই দিয়ে এসবের বিরোধিতা করেছে। অথচ এখন দেখা যাচ্ছে, ইসলামি রাজনৈতিক দলের সমর্থক অনেক লোক গ্রামীণ ব্যাংক, ব্র্যাক, আশা ইত্যাদি সংস্থার সদস্য, গ্রাহক। মোট জনগোষ্ঠীর অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারী। গ্রামীণ ব্যাংকসহ বিভিন্ন এনজিও তাদের ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমে নারীদের অগ্রাধিকারই শুধু দেয় না; তাদের গ্রাহক বা ঋণ-গ্রহীতা সদস্যদের ৯০ ভাগের ওপর নারী। অন্যদিকে, ইসলামি দলগুলো ৯০ ভাগের বেশি নারীর মাঝে কোনো কাজই করছে না।

অন্যান্য ক্ষেত্রেও অনেক সামাজিক সংগঠন বাংলাদেশে অনেক খ্যাতি পেয়েছে। যেমন, সৈয়দা রিজওয়ানা হাসানের নেতৃত্বে পরিবেশবাদি সংগঠন বেলা, বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা), পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলন (পবা), ডব্লিউবিবি ট্রাস্ট ইত্যাদি। এরকম আরও অনেক সংগঠন পরিবেশ নিয়ে কাজ করেছে। ইসলাম পরিবেশ রক্ষার ওপর অনেক গুরুত্ব দিয়েছে। বৃক্ষ রোপনের কথা বলেছে। কিন্তু ইসলামপন্থীরা এসবে নেই। ধূমপান, তামাক ইত্যাদির বিরুদ্ধে কাজ করেছে বিভিন্ন সংগঠন। জাতীয় তামাকবিরোধী জোট, প্রত্যাশা, প্রজ্ঞা ইত্যাদি সংগঠনসহ মাদকের বিরুদ্ধে অনেকগুলো সংগঠন সক্রিয়। এসব কাজেও নেই ইসলামপন্থীরা। ইসলাম নেশার বিরুদ্ধে, মাদকের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানে রয়েছে। ইসলামপন্থীরা ইসলামের এ বিষয়গুলো মানুষের কাছে উপস্থাপন করতে পারত। মাদক, তামাকের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে পারত। এসবের জন্য যে আলাদা এনজিও লাগবে এমন তো নয়; দলের কর্মসূচির মধ্যে এসব রাখলেও হতো।

বাংলাদেশের যেসব এলাকায় ইসলামপন্থীরা শক্তিশালী অবস্থানে যেসব এলাকার মধ্যে কিছু এলাকা আছে যেখানে ইসলামি সংগঠনের নেতা-কর্মী কিংবা দলের নির্বাচিত জনপ্রতিধিরা সামাজিক কাজে বেশি সময় দিয়েছেন। সাতক্ষীরা এমন একটি জেলা যেখানে জেলাব্যাপী শক্তিশালী একটি ঘাঁটি তৈরি করতে সক্ষম হয় দলটি। এটা সম্ভব হয়েছে ওই জেলায় বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান গড়ায় মনোযোগিতার কারণে। ১৯৮৬ সালের নির্বাচনে সাতক্ষীরা-১ (তালা-কলারোয়া) আসনে জামায়াতের আনসার আলি এবং সাতক্ষীরা-২ (সদর) আসনে কাজী শামছুর রহমান নির্বাচিত হন।

কাজী শামছুর রহমান ১৯৯১ ও ১৯৯৬ সালের নির্বাচনেও জামায়াতের প্রার্থী হিসেবে সাতক্ষীরা-২ (সদর) আসন থেকে নির্বাচিত হন। ১৯৯১ সালের জাতীয় নির্বাচনে সাতক্ষীরার পাঁচটি আসনের মধ্যে চারটি আসনেই জামায়াতের প্রার্থী জয়লাভ করে। ২০০১ সালে আবার সাতক্ষীরা ২, ৩ ও ৫

এই তিনটি আসন পায় জামায়াত। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে, ১৯৮৬ সালে সংসদে জামায়াতের ১০টি আসনের মধ্যে ২টি সাতক্ষীরা থেকে, ১৯৯১ সালের ১৮ আসনের মধ্যে ৪টি, ১৯৯৬ সালে ৩টি আসনের মধ্যে ১টি এবং ২০০১ সালে ১৭টির মধ্যে ৩টি এ জেলা থেকে পায়। জেলার সাতটি উপজেলার ৭৮টি ইউনিয়নের মধ্যে অনেকগুলো ইউনিয়নে জামায়াত সমর্থিত প্রার্থীরা ২০১১ ও ২০১৬ সালের নির্বাচনে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়। তিন দশকের ধারাবাহিকতায় সাতক্ষীরায় জামায়াতে ইসলামী সাংগঠনিকভাবে শক্তিশালী ভিত গড়ে তুলেছে। প্রথম আলোর একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই জনভিত্তি তৈরির পেছনে অনেকগুলো কারণের মধ্যে একটি হচ্ছে—জামায়াতের নেতারা এলাকায় বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে। অর্থলগ্নিকারী সংস্থাগুলো থেকে ক্ষুদ্রঋণ পাইয়ে দিয়ে মাঠপর্যায়ে কর্মী সৃষ্টি ও তাঁদের আর্থিকভাবে শক্তিশালী করেছে। এ ছাড়া জামায়াতপন্থী বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠাও আরেকটি কারণ। ১৯৮৬ সালের নির্বাচনেই প্রথমবারের মতো সাতক্ষীরায় জামায়াতের ব্যাপক উত্থানটি স্পষ্ট হয়। এর আগে থেকেই সাতক্ষীরায় জামায়াত তাদের বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। আর্থিকভাবে সহযোগিতা দিয়ে খেটে খাওয়া মানুষকে দলে টানে। ওই নির্বাচনের পর বিভিন্ন অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান থেকে ক্ষুদ্রঋণ পাইয়ে দিয়ে মাঠপর্যায়ের জামায়াতের নেতা-কর্মীদের অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী করে তুলেছে তারা।^৮ অবশ্য, জামায়াতের শক্ত অবস্থানের পেছনে আরও কিছু বিষয় রয়েছে।

যেকোনো রাজনৈতিক কিংবা আদর্শিক সংগঠনের মৌলিক ভিত্তি মজবুত করার জন্য বিভিন্ন সামাজিক বিষয়ে সম্পৃক্ত হওয়ার বিকল্প নেই। যখন তারা বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবে, তখন দেখা যাবে তাদের মাধ্যমে একটি সামাজিক পরিবর্তন সম্ভব হয়ে উঠছে। সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনের জন্যই তো আদর্শিক সংগঠনগুলো তাদের রাজনীতি করে থাকে। কিন্তু এটাই সত্য, পৃথিবীর বেশির ভাগ ইসলামি আন্দোলন সামাজিক কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত নয়।^৯ বাংলাদেশের বিভিন্ন দল এবং এসব দলের নেতা-কর্মীদের মানসিকতা এমন, সামাজিক কাজে সম্পৃক্ত হওয়া যেন অকাজ।

সামাজিক সম্পর্ক রক্ষার বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) খুবই যত্নশীল ছিলেন। পরিবার-পরিজন এবং সমাজের মানুষের প্রতি সুসম্পর্ক রাখার গুণটি হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মধ্যে পূর্ণমাত্রায় ছিল। নবুওয়তের ঘোষণা দেওয়ার পর যে বিষয় তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন এবং কুরআন পরবর্তী সময়ে যে আত্মীয়তার বিষয়ে আয়াত নাজিল করেছে, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবনে সে সকল চারিত্রিক মাধুর্য পূর্বেই বিকশিত হওয়ার ব্যবস্থা আল্লাহ করেছেন। রক্তের আত্মীয়দের ব্যাপারে হজরত সর্বদা যত্নশীল ছিলেন। নবুওয়তের দায়িত্ব পালনের পরও আত্মীয়তার বিষয়ে অনেক হাদিস উল্লেখ করেছেন। কুরআনুল কারিমে অবতীর্ণ হয়েছে—

^৮. দৈনিক প্রথম আলো, ২১ ডিসেম্বর ২০১৩

^৯. Faroque Amin, *Social Welfare Program of Islamic Political Party: A Case Study of Bangladesh Jama'at Islami*, (Sydney: University of Western Sydney, 2016), p, 93

‘তোমরা আল্লাহকে ভয় করো যাঁর নামে তোমরা অধিকার দাবি করো আর সতর্ক থাকো আত্মীয়তার অধিকার ও সম্পর্কের বিষয়ে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।’ আন নিসা : ০১

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন—

‘সাবধান, রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়তা ছিন্নকারীরা জান্নাতে যাবে না।’ বুখারি

তিনি আরও বলেন—

‘ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমি রাসূলের জবানে শুনেছি, তিনি বলেছেন, “তারা মুমিন নয় যারা প্রতিবেশীকে ক্ষুধার্ত রেখে আহার করে।” মেশকাত

আপ্যায়ন, মেহমানদারি হচ্ছে আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী এবং সমাজের মানুষের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষার একটি মাধ্যম। এ এক বড়ো গুণ। হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মধ্যে এ গুণ ছিল অনেক বেশি। তিনি প্রতিবেশীদের খবর না নিয়ে, আসহাবে সুফফার লোকদের আহারের ব্যবস্থা না করে খাবার মুখে দেননি। তাঁর এই উদার চরিত্রকে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম ফুটিয়ে তুলেছেন এভাবে—

‘তোমার ধর্মে অবিশ্বাসীরা তুমি ঘৃণা নাহি করে
আপন তাদের করিয়াছ সেবা ঠাই দিয়ে নিজ ঘরে।’

এরূপ উৎকৃষ্টতম আদর্শের মাধ্যমেই বিশ্বব্যাপী ইসলামের প্রচার ও জাগরণ ঘটেছে। ইসলামি রাজনৈতিক দলগুলোর লোকজনের মধ্যে এই গুণ কম দেখা যায়।

তবে আত্মীয় এবং প্রতিবেশী-পরিজনদের সাথে সুসম্পর্ক রাখতে গিয়ে কোনোভাবেই স্বজনপ্রীতির আশ্রয় নেওয়া যাবে না। স্বজনপ্রীতি, দলীয়করণ, আত্মীয়করণ এগুলো ঘৃণ্য কাজ। আল্লাহ বলেন—

‘আর যখন কথা বলো, তখন ইনসাফের কথা বলো, যদিও ব্যাপারটি নিজের আত্মীয়েরই (বিরুদ্ধে) হোক না কেন।’ আল আনআম : ১৫২

বন্ধদুয়ার পরিবেশ

গণমানুষের সংগঠন হচ্ছে রাজনৈতিক দল। গণমানুষের কথা বলবে, জনগণের জন্য দুয়ার উন্মুক্ত রাখবে, দেশের যেকোনো পর্যায়ের নাগরিকের প্রবেশাধিকার থাকবে, যোগ্যতা অনুযায়ী দলে মূল্যায়িত হবে— এই তো রাজনৈতিক দল। বাংলাদেশের ইসলামি রাজনৈতিক দলগুলোর গঠনতন্ত্র ও সাংগঠনিক কাঠামো এমন যে, যোগ্যতম নাগরিকেরও প্রবেশাধিকার এখানে সংরক্ষিত, অন্য কথায় বন্ধ। দলীয় কর্মসূচি-কর্মপদ্ধতি ও ট্রাডিশন এমন, যে কারও প্রবেশাধিকার এখানে নেই। এই বন্ধদুয়ার পরিবেশ (রেজিমেণ্টেড এনভায়রনমেন্ট) ইসলামি দলগুলোকে পিছিয়ে রেখেছে। বন্ধদুয়ার অবস্থার কয়েকটি দিক তুলে ধরছি :

গঠনতন্ত্র গণরাজনীতির প্রতিকূল : ড. কামাল হোসেন, ব্যরিস্টার মওদূদ আহমদ, মতিয়া চৌধুরী, শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, কাদের সিদ্দীকি, আ.স.ম আব্দুর রব, ড. কর্ণেল (অব.) অলি আহমদ, সৈয়দ মুহাম্মদ ইব্রাহীম বীরপ্রতিক, মাহমুদুর রহমান মান্না- এরা দেশের বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ। এদের কারও কারও রাজনৈতিক দল আবার ছোটো দল হিসেবে পরিচিত। অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনুস, ফজলে হাসান আবেদ, ব্যরিস্টার রফিক-উল-হক, অধ্যাপক ড. এমাজউদ্দিন আহমদ, অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, ড. শাহদীন মালিক- এরা দেশের বিশিষ্ট নাগরিক, কেউ আইনজ্ঞ, কেউ শিক্ষাবিদ। মনে করুন এসব উল্লেখিত রাজনীতিবিদ আর বিশিষ্ট নাগরিকদের সবাই জামায়াতে ইসলামী, খেলাফত মজলিস কিংবা জমিয়তে উলামায়ে ইসলামে যোগদানে আগ্রহী। পারবেন কি? এসব ইসলামি দল কি তাদের গ্রহণ করতে পারবে? এরাও যোগদান করতে পারবে না, আর দলগুলোও তাদের স্বাগত জানাতে পারবে না। কারণ, মূলধারার ইসলামি দলগুলোতে বদ্ধদুয়ার পরিবেশ বিরাজ করছে।

ব্যরিস্টার মওদূদ আহমদ যে দলেই যোগ দিয়েছেন, সরকারে ও দলে বড়ো পদ পেয়েছেন। জামায়াতে ইসলামী কিংবা খেলাফত মজলিসে যোগ দিলে তাঁকে বলা হবে তাদের একটা ওয়ার্ডের অধীনে একটা ইউনিটের কর্মী হতে। অর্থাৎ কাজ করতে হবে দলের ছোটো একটা ইউনিটের সভাপতির অধীনে। ইসলামি এসব ক্যাডারভিত্তিক দল হয়তো দলের শৃঙ্খলা এবং কাঠামো ঠিক রাখার জন্য এটা করছে। তাদের হয়তো যুক্তিও আছে। কিন্তু কোনো দলে এরকম বদ্ধদুয়ার পরিবেশ বিরাজ করলে গণমানুষের রাজনৈতিক দল কোনোদিনও হতে পারবে না, ৭৯ বছর কিংবা ১০০ বছরেও। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সময়ে নেতৃত্বের ক্ষেত্রে তাদেরই বেশি মূল্যায়ন করা হতো, যারা যোগ্য ছিলেন। ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বে সমাজে যারা যোগ্য ও গ্রহণযোগ্য হিসেবে পরিচিত ছিলেন, ইসলামের গ্রহণের পর তারাই বেশি মূল্যায়িত হয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘জাহেলি যুগে যে উত্তম, সে ইসলামি যুগেও উত্তম।’^{১০} তিনি দুআ করেছিলেন, ‘আল্লাহ, দুইটা উমরের একটা উমর চাই’। এই দুআ কবুল হয়েছিল। কিছুদিনের মধ্যে হজরত উমর (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাতকে অনেক বেশি শক্তিশালী করেছিলেন। হজরত উমরের যোগদানের মধ্য দিয়ে ইসলামের অগ্রযাত্রা বেগবান হয়েছে।

বড়ো বড়ো রাজনীতিবিদ কিংবা অন্য ব্যক্তিত্বের জন্য ইসলামি দলে প্রবেশের জটিলতার কথা তো বললাম। আবার এসব দলে যারা থাকেন মূল থেকে, তাদের কারও কারও জন্য নেতা হওয়া খুবই জটিল, আবারও কারও কারও জন্য খুবই সহজ। আওয়ামী লীগ, বিএনপিসহ প্রচলিত রাজনৈতিক দলগুলোর কর্মী-সমর্থক হওয়া সহজ; কিন্তু নেতা হওয়া খুবই কঠিন। অবশ্য খুবই যোগ্যরা এসব দলে এসে অটো নেতা হয়ে যায়। আর এর ঠিক উলটোটি বিরাজ করছে বাংলাদেশের ইসলামি দলগুলোতে। এ দেশের ইসলামি রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর কর্মী-সমর্থক হওয়া কঠিন, কিন্তু নেতা হওয়া খুবই সহজ। অযোগ্যদের ক্ষেত্রে নেতা হওয়া সহজ, যোগ্যদের ক্ষেত্রে কঠিন। বিশ্লেষণে যাচ্ছি।

^{১০}. বুখারি: হাদিস নং-৩৩৫৩, মুসলিম : হাদিস নং- ২৬৩৮, তিরমিজি: হাদিস নং- ২০২৫

ধরুন, অনেক বেশি যোগ্য একজনের নাম ‘রুফাইদ’, তুলনামূলক কমযোগ্য একজনের নাম ‘উফাইদ’। রুফাইদ ভালো সংগঠক, লেখাপড়া জানা লোক, ঐতিহ্যবাহী পরিবারের সন্তান। অন্যদিকে, উফাইদ তুলনামূলক সাধারণ পরিবারের। সাংগঠনিক যোগ্যতাও বেশি নেই। লেখাপড়াও খুব একটা বেশি নয়। রুফাইদ একটি কাডারভিত্তিক ইসলামি দল সমর্থন করেন, কিন্তু দলের কিছু আনুষ্ঠানিকতা, ইউনিট সভাপতি বা আমিরের সাথে যোগাযোগের কমতি এবং বিভিন্ন কারণে ও বিভিন্ন বিষয় মেইনটেইন করে হয়তো দলের উচ্চ স্তরের সদস্য হননি এখনও। কিন্তু দলের একনিষ্ঠ কর্মী। তাঁর মেধা ও যোগ্যতায় দলটি অনেক উপকৃত হচ্ছে। এ সমাজের অনেকে তার কারণে ওই ইসলামি দলের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে সাহস করে না। কিন্তু রুফাইদ দলের কোনো গুরুত্বপূর্ণ পদে নেই। অন্যদিকে উফাইদ দলের কিছু ফরমালিটি মেইনটেইন করে উর্ধ্বতন দায়িত্বশীলদের আনুগত্য করে, প্রয়োজনীয় কিছু পড়া শেষ করে সদস্য হয়ে গেলেন। দলের আনুগত্য ঠিকমতো করার কারণে অল্পদিনের মধ্যে দলের একটা ইউনিটের সভাপতি হয়ে গেলেন। সেই ইউনিটের কর্মী হিসেবে কাজ করছেন রুফাইদ। অথচ জ্ঞান, যোগ্যতা, দক্ষতা, পারিবারিক ঐতিহ্য ও সামাজিক প্রভাবে রুফাইদ যে চেয়ারের বসেন সেই চেয়ারের পাশেও বসার যোগ্যতা উফাইদের নেই। রুফাইদ ও তাঁর পরিবারের সামাজিক যে অবস্থান, তার ধারে-কাছেই নেই উফাইদ। কিন্তু উফাইদ হচ্ছেন রুফাইদের নেতা। এমন বাস্তবতার কারণে অনেক যোগ্যরা, সাধারণেরা দলে অর্ন্তভুক্ত হতে পারে না। বন্ধদুয়ার পরিবেশের কারণে অনেকে কাছেও আসতে পারে না। আর অনেকে আনুগত্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে (হতে পারে এ আনুগত্য কেবলই নেতা হওয়ার জন্য) দলের বড়ো নেতা হয়ে যায়।

দেখা যায়, উফাইদরা উপজেলা ইউনিটের সভাপতি থেকে শুরু করে জেলা পর্যায়েরও নেতা হয়ে যায় মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে। অথচ এসব উফাইদরা প্রচলিত দলের রাজনীতি করলে একটা ইউনিয়ন ইউনিটের ৫১-সদস্য বিশিষ্ট কমিটিতেও স্থান পেতো কি না সন্দেহ। আর রুফাইদরা দলের পদ্ধতিগত কারণে ইউনিয়ন ইউনিটেরও নেতা হতে পারছে না সহজে। এরকম রেজিমেণ্টেড পরিবেশ একটা রাজনৈতিক দলকে গণমানুষের দল হওয়ার পথে বড়ো অন্তরায় হিসেবে কাজ করে। অবশ্য এরকম সিস্টেমের উপকারিতাও আছে। দলের শৃঙ্খলা বিধানের জন্য এরকম পদ্ধতি কাজে লাগে। ইসলামি দলগুলো এ পদ্ধতিতে নেতা নির্বাচন না করে যদি এসব সদস্যদের কাউন্সিলর হওয়ার সুযোগ রাখত তাহলে তারা উপকৃত হতো। অর্থাৎ যোগ্য একজন আসলে সে নেতা হতে পারবে, তবে সদস্য না হলে কাউন্সিলর হতে পারবে না। যোগ্যদের জন্য ছাড় দেওয়ার সুযোগ পৃথিবীর সব জায়গায়। এই যেমন ধরুন, বাংলাদেশের মন্ত্রী হতে হলে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হওয়া লাগবে। কিন্তু বিশেষ কোনো মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী কিংবা বিশেষ যোগ্য কাউকে কাউকে তো টেকনোক্রেট কোটায়ও কেবিনেটে নেওয়া যায়। বাংলাদেশে টেকনোক্রেট মন্ত্রী হওয়ার সুযোগ থাকলেও অনেক বেশি যোগ্যতা নিয়ে ইসলামি দলে গিয়ে নেতা হওয়ার সুযোগ নেই।

কোনো কোনো ইসলামি রাজনৈতিক দল এমন যে, অনেক বড়ো বড়ো ইসলামিক স্কলারদেরও ঠাঁই হয় না দলে পদ্ধতিগত জটিলতার কারণে। আল্লামা মোশাহিদ বায়মপুরী অনেক বড়ো মাপের একজন ইসলামিক স্কলার ছিলেন। তিনি সিলেট অঞ্চলে ব্যাপক পরিচিত হলেও, আসলে একজন বিশ্বমানের পণ্ডিত ছিলেন। ছিলেন উপমহাদেশের একজন শ্রেষ্ঠ ইসলামি পণ্ডিত। আল্লামা হোসাইন আহমদ মাদানির পর তাঁকে দারুল উলুম দেওবন্দের প্রধান মুহাদ্দিস পদে আহ্বান জানালেও প্রত্যাখান করেন। প্রচারবিমুখ খাঁটি একজন আল্লাহর অলি হওয়ায় নিজেকে খুব একটা হাইলাইট করতেন না। যার কারণে ওইভাবে উপমহাদেশে তাঁর পরিচিতি বিস্তৃত হয়নি। এই আল্লামা বায়মপুরী জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদীর প্রতি এবং জামায়াতে ইসলামীর প্রতি দুর্বল ছিলেন। তিনি মাওলানা মওদুদীর সাহিত্য পড়ে খুব বেশি অনুপ্রাণিত হন। যদিও তাঁর রাজনৈতিক দল ছিল জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম। জামায়াতের বদ্ধদুয়ার পরিবেশ না থাকলে মাওলানা মোশাহিদ বায়মপুরীর হয়তো এ দলের সাথে অন্তর্ভুক্ত থাকতেন এবং জামায়াতের এমপি হতেন।

মোশাহিদ বায়মপুরীর এতটা জনভিত্তি ছিল যে, পাকিস্তান আমলে ইসলামি দলগুলো যেখানে তাদের কয়েকজন নেতাকেও নির্বাচিত করিয়ে আনতে পারেনি, সেখানে তিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে ‘চেয়ার’ প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করে বিপুল ভোটে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন ১৯৬২ সালে। তার কাছে পরাজিত হন সাবেক স্পিকার হুমায়ুন রশিদ চৌধুরীর মাতা সিরাজুন্নেসা চৌধুরীর মতো বিদুষী নারী। ১৯৬৫ সালে ‘গোলাপফুল’ প্রতীক নিয়ে মুসলিম লীগের প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করে সামান্য ভোটে পরাজিত হন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে যেখানে চারিদিকে আওয়ামী লীগের জয়ধ্বনি, জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের প্রার্থীরা নির্বাচনে জামানত হারান দেশের বিভিন্ন জায়গায়, সে নির্বাচনে জমিয়তের ‘খিজুরগাছ’ প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করে জয়ের দ্বারপ্রান্তে চলে গিয়েছিলেন। এটা সম্ভব হয়েছিল তার বিশাল ব্যক্তিত্ব এবং পাণ্ডিত্যের কারণে। ১৯৭১ সালে তিনি মারা যান।

এই প্রথিতযশা ইসলামিক স্কলার জামায়াতে ইসলামী থেকে নির্বাচন করতে চাইলেও পারেননি। কারণ, তিনি জামায়াতের রুকন (সদস্য) ছিলেন না। তখন জামায়াতের বিধান ছিল রুকন ছাড়া কাউকে মনোনয়ন দেওয়া হবে না। দলীয় রুকন না হওয়ার কারণে ভেতরে ভেতরে জামায়াতের প্রতি সমর্থন থাকলেও জামায়াতের রাজনীতিতে সক্রিয় না হওয়ায় একটা পর্যায়ে জমিয়তের রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হন। জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের গঠনতন্ত্র ও সাংগঠনিক কাঠামো গণরাজনীতির প্রতিকূল হলেও আলেমদের বেলায় সুযোগ সীমিত নয়। এজন্য মোশাহিদ বায়মপুরীকে তারা ধারণ করতে পেরেছিল।

জামায়াতের সংস্কারপন্থীরাও স্বীকার করছেন যে, তাদের দলের বদ্ধদুয়ার পরিবেশ (রেজিমেণ্টেড এনভায়রনমেন্ট) থাকায় ইসলামি মূল্যবোধসম্পন্ন উদারনৈতিক ব্যক্তির এই দলে প্রবেশ করতে পারে না। ড. হাসান মোহাম্মদের মতে—

‘ইসলামি আদর্শানুসারী ক্যাডার সংগঠন জামায়াত তার সদস্যদের জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করতে চায়। এজাতীয় সংগঠন সদস্যদের স্বাধীন চিন্তাশক্তি বিকাশে সাধারণত সহায়ক হয় না। পাশ্চাত্যের সর্বাত্মকবাদ আদর্শানুসারী সংগঠনসমূহের প্রভাব বিস্তারকরণ প্রচেষ্টার সঙ্গে এ ক্ষেত্রে জামায়াতে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।’^{১১}

জামায়াতে ইসলামীর ওপর পিএইচডি গবেষণা করে এই অভিমত ব্যক্ত করেন ড. হাসান মোহাম্মদ আরও প্রায় দুই যুগ আগে। এর পরবর্তী সময়ে এ কথার বাস্তবতাও পাওয়া গেছে।

ক্যাডারভিত্তিক সাংগঠনিক কাঠামো ও অতিমাত্রায় গোপনীয়তার নীতি : ক্যাডারভিত্তিক সাংগঠনিক কাঠামো হওয়ায় কিছু কিছু ইসলামি সংগঠনের নেতা-কর্মীদের মধ্যে সাংগঠনিকভাবে অতিমাত্রায় গোপনীয়তা রক্ষার কালচার তৈরি হয়েছে। এই নীতির কিছু কল্যাণকর দিক থাকলেও সামগ্রিক বিচারে অনেক ক্ষতিকর। এখানে প্রত্যেক ক্যাডার (স্তর)-এর জন্য আলাদা গোপনীয়তার নীতি পরিলক্ষিত হয়। সামগ্রিকভাবে ভেতরের কথা বাহিরে বলা যাবে না। এই ধরনের গোপনীয়তার চর্চা একজন কর্মীকে অন্ধ আনুগত্য করতে শেখায়। এতে একটি দলের বৈধ কার্যক্রমকেও মানুষ সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখে।

নামের মধ্যেই জনবিচ্ছিন্নতা : জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম, বাংলাদেশ উলামা কমিটি-এসব দলের নামের মধ্যে রয়েছে জনবিচ্ছিন্নতা, অন্যকথায় বদ্ধদুয়ার পরিবেশ। কেবল আলেম-ওলামাদের নিয়ে জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম গঠিত হয় জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ নামে ১৯১৯ সালে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে এখন পর্যন্ত এই ১০০ বছরে আলেম-ওলামারাই সব সময়ই এ দলের নেতৃত্ব দিয়েছেন। জমিয়ত শব্দের অর্থ দল, উলামা হচ্ছে আলেম-এর বহু বচন। আমাদের দেশে সাধারণত মাদ্রাসার উচ্চতর ডিগ্রিধারীদের আলেম-ওলামা বলা হয়। হিন্দ বলতে হিন্দুস্থান বা ভারতবর্ষকে বোঝানো হয়েছে। অতএব, জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ-এর অর্থ দাঁড়াল ভারতবর্ষের ওলামাদের দল বা সংগঠন। এরকম নাম সাধারণত পেশাজীবী সংগঠনের হয়ে থাকে। একটি রাজনৈতিক দল জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে। সে হিসেবে রাজনৈতিক দল জনগণকে উদ্দেশ্যে করে গঠিত হবে। পেশাজীবী সংগঠনের নাম সাধারণত পেশাজীবীদের পরিচয় বহন করে এমন শব্দ দিয়ে হয়। যেমন, ডাক্তারদের সংগঠন ‘বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন’। এখানে মেডিকেল শব্দ দ্বারা ডাক্তার সম্প্রদায়কে বোঝানো হয়েছে। সাংবাদিকদের সংগঠন ‘সাংবাদিক ইউনিয়ন’ বা ‘প্রেসক্লাব’ বা ‘রিপোর্টার্স ইউনিটি’। সাংবাদিক ইউনিয়নের ‘সাংবাদিক’ শব্দ দিয়ে সাংবাদিক সম্প্রদায়কে বোঝানো হয়েছে। একইভাবে প্রেসক্লাবের প্রেস, রিপোর্টার্স ইউনিটির রিপোর্টার্স বলতে গণমাধ্যম সম্প্রদায়কে বোঝানো হয়েছে। রাজনৈতিক দলের নাম এরকম সম্প্রদায়গত শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে হয় না। আলেম-ওলামা একটা সম্প্রদায়। আলেম-ওলামাদের সংগঠনের

^{১১}. ড. হাসান মোহাম্মদ, *জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ : নেতৃত্ব, সংগঠন ও আদর্শ*, (ঢাকা : একাডেমিক পাবলিশার্স, ১৯৯৩), পৃষ্ঠা-১৫৮

নাম আলেম-ওলামাদের নামে হতে পারে। যেমন মাদ্রাসা শিক্ষকদের একটি সংগঠনের নাম জমিয়াতুল মুদাররিসীন বাংলাদেশ। ঠিক আছে। কিন্তু জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম রাজনৈতিক দলের নাম হলেও জনগণের কাছাকাছি যেতে পারেনি তাদের প্রতিষ্ঠার এই ১০০ বছরে। এখনও দলটি আলেম-ওলামা বা একটি সম্প্রদায়ের সংগঠন হিসেবে বিবেচিত। সাধারণ জনগণের প্রতিনিধিত্ব এ দলে নেই বললেই চলে। এ দলের শীর্ষ নেতারা যেমন মাদ্রাসা পড়ুয়া হয়ে থাকেন, তেমনি এ দলের তৃণমূলের নেতা-কর্মীরাও মাদ্রাসা পড়ুয়া। ফলে সাধারণ জনগণের আস্থা পায়নি তারা।

জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের গঠনতন্ত্রের অনেক কিছু রয়ে গেছে বর্তমান সময়ের সাথে অমিল। এজন্য জেনারেল ধারার তরুণরা এ সংগঠনের ব্যানারে কাজ করতে আগ্রহী নন। জেনারেল ধারার কাউকে এ সংগঠনে দেখাও যায় না। একসময় ছাত্র রাজনীতি হারাম ফতোয়া দিলেও বর্তমানে তারা হালাল করে নিয়েছেন। তবে ছাত্রদের সিনিয়র নেতা হতে হবে হুজুর বা মাওলানা। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সভাপতি বা জেলা, থানা সভাপতি হতে হবে শিক্ষক সমাজ থেকে। ছাত্রদের সংগঠন ছাত্ররাই পরিচালনা করবে- এটাই নিয়ম। কিন্তু জমিয়ত এই নিয়মের আওতায় নয়।

এ ছাড়া মূল সংগঠনটির অঘোষিত নিয়ম চালু রয়েছে, প্রত্যন্ত গ্রামে পড়ে থাকা খুবই বয়স্ক আলেম অখ্যাত খলিফায়ে মদনীকে মূল দলের কেন্দ্রীয় সভাপতি করা হয়। ফলে সংগঠনটির অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ যেমন দিন দিন দুর্বল হয়ে পড়ছে, তেমনি দলের পরিধি আরও ছোটো হচ্ছে। জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের কেন্দ্রীয় সভাপতি মাওলানা শায়খ আব্দুল মোমিন দীর্ঘদিন থেকে। এর আগে দলের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন মাওলানা আশরাফ আলি বিশ্বনাথী, মাওলানা আব্দুল করীম শায়খে কৌড়িয়া। এই তিনজনের বিষয়টি যদি বিশ্লেষণ করা যায় তাহলে দেখা যাবে, তিনজনকেই দলের সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয় বয়সের দিক থেকে প্রবীণ এবং বড়ো আলেম হওয়ার কারণে। ওনারা প্রত্যেকেই বিভিন্ন মাদ্রাসা প্রধানের দায়িত্বে ছিলেন। এলাকার মানুষের কাছে আলেম হিসেবে গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। এই গ্রহণযোগ্যতাকে পুঁজি করে তাদেরকে দলের প্রধান পদে বসানো হয়। আলেম হিসেবে গ্রহণযোগ্যতা যেমন সাংগঠনিক যোগ্যতার প্রমাণ নয়; তেমনি যিনি জনগণের কাছে আলেম হিসেবে গ্রহণযোগ্য তিনি জনগণের কাছে নেতা হিসেবে গ্রহণযোগ্য না-ও হতে পারেন। ফলে দেখা যায়, এসব বয়োজ্যেষ্ঠ আলেমরা দলের বড়ো পদ ধারণ করলেও রাজনীতিতে তারা অনেক পিছিয়ে। দলের প্রধান পদ শুধু নয়; জেলা সভাপতি থেকে শুরু করে উপজেলা সভাপতিসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃত্বে তাদেরকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়, যারা মাদ্রাসার শিক্ষক এবং শিক্ষক হিসেবে ছাত্রদের কাছে গ্রহণযোগ্য। সারা দেশের জেলা সভাপতি তিনি যিনি ওই জেলার কোনো না কোনো মাদ্রাসার প্রধান কিংবা শিক্ষক। এর বাইরে জেলা সভাপতি কিংবা অন্য কোনো পদে জমিয়তের কাউকে পাওয়া দুষ্কর হবে। এতে দেখা যায়, এরা শিক্ষক হিসেবে গ্রহণযোগ্য হলেও সাংগঠনিক যোগ্যতার দিক থেকে ততটা যোগ্য নয়। ফলে রাজনীতি রয়ে যায় ওনাদের নিজ ছাত্রদের মাঝে সীমাবদ্ধ।

জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের এক সময়ের রাজনৈতিক প্লাটফর্ম নেজামে ইসলাম পার্টিতে সকলের অন্তর্ভুক্তির সুযোগ থাকায় ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের অধীনে ৩৬ টি আসন পেয়ে যায়। এই ৩৬ জন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির অনেকে ছিলেন ১৯৪৭ পূর্ববর্তী ভারতীয় কংগ্রেসের নেতা কিংবা মুসলিম লীগের নেতা। তারা নেজামে ইসলাম পার্টি করতেন না। কিন্তু যুক্তফ্রন্ট গঠিত হওয়ার পর শেরে বাংলা এ.কে ফজলুল হকের প্রভাবে তারা নেজামে ইসলামি পার্টির নমিনেশন নিয়ে নির্বাচন করে জিতে যান। এতে তারা যেমন নির্বাচিত হন, তেমনি নেজামে ইসলাম পার্টিও দল হিসেবে ইতিহাস সৃষ্টি করে। সেদিন নেজামে ইসলাম থেকে কয়েকজন মন্ত্রীও হন। যারা নেজামে ইসলামের মূল লোক ছিলেন তারাই মন্ত্রী হয়েছেন। অন্যরা আসায় দর কষাকষির জায়গায় নেজামে ইসলাম এগিয়ে যায় এবং বেশি মন্ত্রীত্ব পায়।

জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের পাশাপাশি অন্য আরও অনেক ইসলামি রাজনৈতিক দলের অবস্থা প্রায় একই। বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনের কেন্দ্রীয় নেতারা রাজধানীর কামরাঙ্গিরচর ও অন্য আরও কিছু এলাকার মাদ্রাসার শিক্ষক। খেলাফত মজলিসেরও নেতারা কোনো না কোনো মাদ্রাসার শিক্ষক। ইসলামী ঐক্যজোটের নেতারা রাজধানীর লালবাগ মাদ্রাসার এবং অন্য আরও কিছু মাদ্রাসার সঙ্গে সম্পৃক্ত। মাদ্রাসা পরিচালনা আর রাজনৈতিক দল পরিচালনা যে এক বিষয় নয়, এ কথা যেন বুঝতেই চান না এসব ইসলামি সংগঠনের নেতারা।

আধুনিক ধ্যানধারণার অভাব

রাজনীতি জুটিল-কুটিল বিষয়। রাষ্ট্র পরিচালনার সাথে সম্পর্ক। রাষ্ট্র পরিচালনা সহজ বিষয় নয়। এর জন্য প্রয়োজন অন্য কথায় গণমানুষের রাজনীতির জন্য প্রয়োজন আধুনিক ধ্যানধারণার লালন ও বাস্তবায়ন। বিশ্বায়নের পরিবর্তনের ধারায় রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে আধুনিক ধ্যানধারণা নিয়ে জনগণের কাছে যাওয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রায় সকল ইসলামি সংগঠনের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। আইন প্রণয়ন, উন্নয়ন কৌশল, অর্থনীতি ও পররাষ্ট্র নীতির মতো মৌলিক বিষয়ে তারা নাওয়াকিফ। কিছু ইসলামি দল আছে যারা আইন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি, পদার্থবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ে যথার্থ গুরুত্ব না দিলেও কিছুটা অন্তত দিয়ে থাকে। কিন্তু কওমি ঘরানার যেসব প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যেসব রাজনৈতিক সংগঠন রয়েছে তাদের কাছে এসব বিষয় দুনিয়াবি বিষয় হিসেবেই গণ্য। দুনিয়াবি বিষয়ে সম্পৃক্ত হওয়া তাদের কাছে অপরাধের মতো মনে হয়। প্রতিষ্ঠার দেড়শো বছর পরও দেওবন্দ মাদ্রাসায় বিজ্ঞান, সামাজিক বিজ্ঞান, ব্যবসায় প্রশাসন ইত্যাদি বিষয়ের কোনো পাঠ নেই। দেওবন্দ মাদ্রাসায় যেহেতু নেই, অন্যগুলোতে তো প্রশ্নই আসে না। এসব দলের সাথে সম্পৃক্ত শিক্ষাব্যবস্থায় ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, ব্যাংকার, আমলা, উকিল ইত্যাদি গড়ে তোলার ব্যবস্থা নেই।

আধুনিক ধ্যানধারণার ধারে কাছেও না ভিড়ে, তারা কীভাবে রাষ্ট্রক্ষমতা চিন্তা করে। তারা মনে করে ধর্মীয় কয়েকটি কিতাব পড়লেই যথেষ্ট, আর লাগবে না। অথচ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ভাবনা এরকম ছিল না। বদর যুদ্ধ সংগঠিত হয় মক্কার কুরাইশদের সাথে। অন্য কথায় অমুসলিমদের সাথে। এ যুদ্ধে মক্কার বাহিনী পরাজিত হলে অনেকেই যুদ্ধবন্দি হয়ে মদিনার কারাগারে আসে। এসব যুদ্ধবন্দিদের কাউকে কাউকে এই শর্তে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে, তারা ১০ জন মুসলিমকে পড়ালেখা শেখাবে।^{১২} অমুসলিমরা মুসলিমদের কী জ্ঞান দেবে?

ধর্মের জ্ঞানের প্রশ্নই তো উঠে না। তাহলে যেসব যুদ্ধবন্দির মুক্তি দেওয়া হয়েছিল ১০ জন করে মুসলিমকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য, সেটা কী শিক্ষা ছিল? সেটা নিশ্চয়ই দুনিয়াবি, কৌশলগত, বাস্তব জীবনে চলতে-ফিরতে প্রয়োজনীয় শিক্ষা। আর এই শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন স্বয়ং নবি মুহাম্মদ (সা.)-এর সময়ে নবির সাহাবিরা। কওমি মাদ্রাসার এরা এসব মনে হয় চিন্তাও করতে পারবে না। কোনো কওমি মাদ্রাসায় বাংলা বা ইংরেজি বিষয়ের শিক্ষক হিসেবে কোনো হিন্দু কিংবা অন্য কোনো সম্প্রদায়ের কাউকে শিক্ষক হিসেবে কি তারা কল্পনা করতে পারে? অথচ বদর যুদ্ধের যুদ্ধবন্দিরা ছিলেন অমুসলিম; আর তারা শিখিয়েছেন মুসলিমদের।

মূলধারার যেসব ইসলামি সংগঠন, রাষ্ট্রীয় বিষয়ে তাদের বক্তব্য জনগণের কাছে যেমন স্পষ্ট নয়; তেমনি আকর্ষণীয়ও নয়। সমস্যা সংকুল বাংলাদেশের বেশ কিছু মৌলিক সমস্যা রয়েছে। সব দলই এসব বিষয়ে কোনো না কোনো বক্তব্য দিয়ে থাকে। প্রচলিত রাজনৈতিক দলগুলোর ব্যাপারে মানুষের নেতিবাচক ধারণা রয়েছে। এসব দলের বেশির ভাগ নেতা দুর্নীতি আকর্ষণ নিমজ্জিত। এসব দুর্নীতিপরায়ণ নেতৃত্বকে মানুষ গ্রহণ করছে তাদেরকে দুর্নীতিবাজ ও অসৎ জেনেই। কারণ, বাংলাদেশের ইসলামি দলগুলো প্রচলিত এসব দলের অসৎ নেতৃত্বের বিকল্প হিসেবে তাদের নিজদের জাতির সামনে তুলে ধরতে পারেনি। এই না পারার ব্যর্থতার অন্যতম কারণ, আধুনিক ধ্যানধারণার অভাব।

প্রতিটি রাজনৈতিক দলেরই গঠনতন্ত্র থাকে। একটি রাজনৈতিক দল, যা রাষ্ট্র শাসনের উদ্দেশ্যে নির্বাচনে অংশ নেয়। এটা ব্যবসার কোনো কোম্পানি নয় অথবা নানা ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত বিরাট কোনো বিনোদন ক্লাবও নয়। তাদের গঠনতন্ত্রে তাদের রাষ্ট্র পরিচালনার দর্শন ফুটে ওঠে। আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি প্রভৃতি রাজনৈতিক দলের গঠনতন্ত্র তাদের নিজ নিজ দলের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, সাংগঠনিক কাঠামো, সাংস্কৃতিক ধ্যানধারণা ও দর্শনের প্রতিনিধিত্ব করে। একটি দল কতটা গণমুখী হবে সেটা অনেক সময় নির্ভর করে দলটির নেতৃত্ব, সিদ্ধান্ত এবং সাংগঠনিক কাঠামোর ওপর। আর এসব বিষয় নির্ধারিত হয় গঠনতন্ত্রের আলোকে। ইসলামি রাজনৈতিক দলগুলো গণমুখী হওয়ার ক্ষেত্রে তাদের গঠনতন্ত্র প্রধান অন্তরায়। আর এটা হয়েছে আধুনিক ধ্যানধারণার অভাবে। অথচ ইসলাম অ-আধুনিক নয়, গণবিমুখ কোনো ধর্ম নয়।

^{১২}. Tariq Ramadan, *Islam, the West and the Challenges of Modernity*, (Liecester, UK: The Islamic Foundation, Reprinted, 2004), p.121

বাংলাদেশের ইসলামি দলগুলোর গঠনতন্ত্রে কৃষক-শ্রমিকশ্রেণির মুক্তি ও উন্নতি, হিন্দুসহ অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের জন্য সমানাধিকার, পিছিয়ে পড়া উপজাতিসমূহকে জীবন মান ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এগিয়ে আনা, নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সমানাধিকার প্রতিষ্ঠিত করা, পরিবেশ উন্নয়ন, মত ও প্রেসের স্বাধীনতা ইত্যাদি বিষয়ে সুস্পষ্ট কোনো কথা নেই। বিভিন্ন ইসলামি দলের গঠনতন্ত্র পাঠ করলে দেখা যাবে, এসব দলের গঠনতন্ত্র কোনো ধর্ম প্রচার সমিতির গঠনতন্ত্র মাত্র, রাজনৈতিক দলের গঠনতন্ত্র নয় বলেই মনে হয়।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ইস্যু

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ইস্যু বাংলাদেশের রাজনীতিতে একটা ফ্যাক্টর। ইসলামি রাজনৈতিক দলগুলো এখানে ধাক্কা খেয়েছে। জামায়াতে ইসলামী, মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলাম পার্টি, জমিয়তে উলামায়ে ইসলামসহ বিভিন্ন দলের রাজনীতি নিষিদ্ধ হয়ে যায় স্বাধীনতার পরপর। সাংবিধানিকভাবে ধর্মীয় রাজনীতি নিষিদ্ধ হয়। একাত্তর ইস্যুতে জামায়াতে ইসলামীর শীর্ষ নেতাদের ফাঁসি দেওয়া হয়েছে। দলের নিবন্ধন বাতিল হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ ইস্যু রাজনৈতিক ফ্যাক্টর হওয়া সত্ত্বেও ১৯৭৯, ১৯৮৬, ১৯৯০ ও ২০০১-এর নির্বাচনে ফলাফল পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, জামায়াত সেই ধাক্কা থেকে অনেকটা বের হয়ে আসতে পেরেছিল। কিন্তু ২০০৯ সালে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন হওয়ার পর মুক্তিযুদ্ধ ইস্যু নিয়ে জামায়াতের বিরুদ্ধে প্রচারণা ও অবস্থান এবং শেষ পর্যন্ত শীর্ষ নেতাদের গ্রেফতার ও ফাঁসি কার্যকরের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ ইস্যুতে দলটির প্রতি জনমনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে। গ্রহণযোগ্য জাতীয়ভিত্তিক ইমেজ তৈরি দলটির জন্য কঠিন হয়ে পড়েছে। কয়েক বছর আগে জামায়াতের সংস্কারপন্থীদের একটি বৈঠকেও বিষয়টি এভাবে ব্যাখ্যা করা হয়।^{১৭} ১৯৭১ ইস্যুতে দলটির আটকে থাকাকে উল্লেখ করে জামায়াতের সহকারি সেক্রেটারি জেনারেল ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক ২০১৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি পদত্যাগ করেন।^{১৮}

জনগণের বড়ো অংশটি ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিল। এটা সত্য যে, পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি অর্থনৈতিক বৈষম্য করেছিল। শাসন ক্ষমতায় যারা ছিলেন তারা দুঃশাসনই উপহার দিয়েছিলেন। সেইসাথে এটাও সত্য যে, আওয়ামী লীগ এসব বিষয়কে কাজে লাগিয়ে গণ-আন্দোলন তৈরি করতে পেরেছিল। ভারতের আধিপত্যবাদী আচরণের আশঙ্কা থেকে ইসলামি দলগুলোর মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করার বিষয়টি রাজনৈতিক মত-পার্থক্য হিসেবে গণ্য করা গেলেও পাকিস্তানি সামরিক জান্তার পক্ষে যে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল তা দেশের জনগণ কর্তৃক গ্রহণযোগ্য হয়নি। সামরিক জান্তার পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে জামায়াতে ইসলামী,

^{১৭}. দৈনিক মানবজমিন, ৯ সেপ্টেম্বর ২০১২

^{১৮}. বিবিসি বাংলা, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ (<https://www.bbc.com/bengali/news-47247641>)

নেজামে ইসলাম পার্টিসহ এসব ইসলামি দলের রাজনৈতিক কৌশলেরও পরাজয় ঘটে। প্রায় চার দশকের ব্যবধানে বিষয়টি জাতি ভুলতে বসেছিল; কিন্তু ২০০৯ সালের পর আবারও সামনে আসে। বিষয়টি সাধারণ জনগণের মধ্যে কতটা নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে তা পরিমাপ করা না গেলেও নতুন প্রজন্মের মধ্যে যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে তা বলা যেতে পারে।^{১৫}

২৫ মার্চের রাতে ‘বিদ্রোহ দমন’ ও ‘পাকিস্তান রক্ষার’ নামে ঢাকায় চলে পাকিস্তান আর্মির অভিযান। শেখ মুজিবুর রহমান গ্রেফতার হলেন। অবশ্য শেখ মুজিবুর রহমান গ্রেফতার হলেও ‘ঢাকায় অবস্থানকালীন পরিবারের ব্যয় বহনকল্পে পাক সরকার শেখ মুজিবুর রহমানের স্ত্রী বেগম ফজিলাতুননেসাকে প্রতি মাসে ১৫০০ (পনেরো শত টাকা) টাকা মাসিক ভাতার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।’^{১৬} যাহোক, ২৫ মার্চের কালো রাত থেকে ভিন্ন এক পরিবেশ চলে এলো। শুরু হলো নয় মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তি সংগ্রাম। এ সংগ্রামে দেশের বেশির ভাগ জনগণ যে ছিল, এটুকু বুঝা তখন পর্যন্ত জামায়াতে ইসলামীর ছিল। প্রথম এই পরিস্থিতিতে দলটি নিরপেক্ষ থাকার সিদ্ধান্ত নেয়। তৎকালীন কেন্দ্রীয় জামায়াতের নায়েবে আমির এবং পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর সাবেক আমির মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম আঁচ করতে পেরেছিলেন, বুঝেছিলেন দেশ স্বাধীন হবেই হবে। বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মতের বিপরীতে গেলে বিষয়টি পরবর্তীতে ভোগাবে। এই উপলব্ধি আর দূরদর্শী চিন্তা থেকে তিনি তখনকার পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতের আমির গোলাম আযমকে বলেন, সেনা-অভিযানকে সমর্থন না দিতে। মাওলানা আবদুর রহীম সে সময় সেনা-অভিযানকে সমর্থন না দেওয়ার জন্যে জামায়াত প্রধান সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদীকে চিঠিও দিলেন।^{১৭} শেষ পর্যন্ত আর দলটি নিরপেক্ষ থাকতে পারল না। জামায়াতে ইসলামী থেকে সদ্য পদত্যাগ করা সহকারি সেক্রেটারি জেনারেল ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক এ সম্পর্কে লিখেন, ‘তঁার (গোলাম আযম) আত্মজীবনী পড়লে জানা যায় : এ সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাঁর সমসাময়িক তিন রাজনীতিবিদ পূর্ব বাংলার প্রাক্তন মূখ্যমন্ত্রী জনাব নূরুল আমিন, মুসলিম লীগ নেতা খাজা খায়ের উদ্দিন, এবং নেজামে ইসলাম পার্টির নেতা মৌলবি ফরিদ আহমদ তাকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিলেন। ৪ এপ্রিল ১৯৭১ সালে তিনি এবং এই তিন নেতা জেনারেল টিক্কা খানের সাথে সাক্ষাৎ করেন। এই সাক্ষাৎই ছিল পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে সমর্থনে তাঁর প্রথম পদক্ষেপ।’^{১৮}

^{১৫} দৈনিক মানবজমিন, ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৫

^{১৬} অলি আহাদ, *জাতীয় রাজনীতি : ১৯৪৫ থেকে ৭৫*, (ঢাকা : বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিমিটেড, চতুর্থ সংস্করণ ২০০৪), পৃষ্ঠা-৩৯৪

^{১৭} এসএম সাখাওয়াত হুসাইন, *ইসলামি রাজনীতিতে মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম*, দৈনিক ইনকিলাব, ১ অক্টোবর ২০১৬

^{১৮} গোলাম আযম সম্পর্কে যা বললেন ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক (লিংক : <http://dnn.news/> গোলাম-আযম-সম্পর্কে-যা-বলল/), ২০১৭ সালের ২৩ অক্টোবর অধ্যাপক গোলাম আযমের তৃতীয় মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে এ লেখা লিখেন আব্দুর রাজ্জাক। লেখাটি অবশ্য মূলধারার কোনো মিডিয়ায় প্রকাশিত হতে দেখা যায়নি। তবে ইসলামী ছাত্রশিবিরের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি মজিবুর রহমান মঞ্জুসহ কেউ কেউ এটা ফেসবুকে শেয়ার করেছেন। এতে বোঝা যায়, এটি ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক নিজেই লিখেছেন।

সেনাবাহিনী বিভিন্ন ইসলামি দল ও পাকিস্তানপন্থী দলগুলোকে নিয়ে গঠন করল ‘শান্তি কমিটি’। সেই কমিটিতে ইসলামপন্থী, পাকিস্তানপন্থী দলগুলোর অনেক শীর্ষ নেতা অন্তর্ভুক্ত হলেন। আওয়ামী লীগেরও অনেকে দলত্যাগ করে শান্তি কমিটিতে যোগ দেয়। বর্তমান আওয়ামী লীগের অনেক মন্ত্রী, এমপি ও নেতাদের পিতা-স্বজন শান্তি কমিটিতে ছিলেন। সে সময় মাওলানা আবদুর রহীম শান্তি কমিটিতে যোগদানের বিষয়কে অযৌক্তিক মনে করলেন। তাঁর এই ভূমিকাকে অনেকেই সুনজরে দেখলেন না। তখন অনেকে তাঁর প্রতি সন্দেহের নজর নিক্ষেপ করল। তাঁর ওপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নানা চাপ আসতে লাগল। ‘মুক্তি’ খোঁজার নামে সেনাবাহিনী কয়েক দফা গভীর রাতে তাঁর বাসভবনে তল্লাশি অভিযান চালাল।^{১৯} পাশাপাশি নানা প্রক্রিয়ায় তাকে ব্লাকমেইল করা হলো। বাধ্য করা হলো মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে নিজের অবস্থানকে স্পষ্ট করতে।

একাত্তরের পুরোপুরি সুফল ভোগ করছে আওয়ামী লীগ। স্বাধীনতার কয়েক বছর পর জামায়াতে ইসলামী পুনরায় নিজ নামে আবির্ভাবের পর থেকে একাত্তর বিতর্ক কখনোই তাদের পিছু ছাড়েনি। অন্যান্য ইসলামি দলও একাত্তর ইস্যুতে প্রশ্নের উর্ধ্বে নয়। অনেকটা সত্য ও মিথ্যার মিশেলে তাদের ওপর দায় চাপানো হচ্ছে। বদরুদ্দীন উমর লিখেন—

‘১৯৭১ সালে যারা অথও পাকিস্তান চেয়েছিলেন তারাই যুদ্ধাপরাধী, এমন এক চিন্তা লোকের মাথায় ঢোকানো হয়েছে। কিন্তু কোনোভাবেই এ ধরনের লোককে যুদ্ধাপরাধী বলা চলে না। যুদ্ধাপরাধী তাদেরকেই বলা যায়, যারা নিজেরা দেশের জনগণের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল এবং সক্রিয়ভাবে শত্রুদের সঙ্গে মিলিতভাবে জনগণের বিরুদ্ধে অনেক অপরাধ করেছিল। এখানে বিশেষভাবে যা বলা দরকার তা হলো, ১৯৭২ সালে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে যারা সরকারি ক্ষমতায় ছিলেন, তারা যুদ্ধাপরাধীদের কোনো বিচার করেননি। ওপরন্তু যাদের সে সময় যুদ্ধাপরাধী হিসেবে প্রথমদিকে গ্রেফতার করা হয়েছিল তাদের সবাইকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৪ সালে (পাকিস্তানের) লাহোরে অনুষ্ঠিত ইসলামি সম্মেলন থেকে ফিরে এসে ভারতীয় সাংবাদিক কুলদীপ নায়ারকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন যে, ১৯৭১ সালে যা হয়েছিল তা ভুলে যাওয়া দরকার। ...আওয়ামী লীগ যে সত্যি সত্যি যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করেনি এবং বিচার চায়নি, এটা বোঝা যায় যখন তারা ১৯৫ জন তালিকাভুক্ত পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর অফিসারকে বাংলার মাটিতে এনে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে বিচারের কোনো ব্যবস্থা করেনি। ...দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যুদ্ধাপরাধীদের যে বিচার হয়েছিল তার মধ্যে একমাত্র হিটলারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী রিবেন ট্রপ ছাড়া অন্য সবাই ছিল সামরিক বাহিনীর লোক। এই বিচার যারা করছেন, তারা পাকিস্তানের ১৯৫ জন সামরিক অফিসারকে বিচারের জন্য বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়ার কোনো দাবি করছেন না। তারা শুধু বলছেন, ১৯৭১ সালে যুদ্ধের ও মানবতাবিরোধী কর্মকাণ্ডের জন্য পাকিস্তানকে ক্ষমা ভিক্ষা করার কথা। কিন্তু এ ক্ষমা ভিক্ষার কোনো দাবি

^{১৯}. এসএম সাখাওয়াত হুসাইন, ইসলামি রাজনীতিতে মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, দৈনিক ইনকিলাব, ১ অক্টোবর ২০১৬

আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলি ভুট্টোর কাছে জানাননি। ১৯৭১ সালের পরিস্থিতিতে সবচেয়ে বড়ো ও প্রধান যুদ্ধাপরাধী ছিল ভুট্টো। এহেন ভুট্টোকে ক্ষমা চাইতে বাধ্য করা তো দূরের কথা; শেখ মুজিব নিজেই পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ভুট্টোকে শুধু ক্ষমাই করেননি; বাংলাদেশের মহা সম্মানিত ব্যক্তি হিসেবে তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন! এরপর ভুট্টো ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ সফরে এসেছিলেন। পাকিস্তানকে ক্ষমা চাওয়ার দাবির থেকে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ঠিকমতো করার জন্য যে দাবি পাকিস্তানের কাছে জোর দিয়ে করা দরকার তা হলো, ১৯৫ জন চিহ্নিত পাকিস্তানী সামরিক অফিসারের মধ্যে যারা এখনও জীবিত আছে তাদের বিচারের সম্মুখীন করার জন্য বাংলাদেশে পাঠানো। এ নিয়ে আওয়ামী লীগ সরকারের কোনো চিন্তা নেই। এসব থেকে বোঝা যায় যে, আওয়ামী লীগ সরকার প্রকৃত যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের থেকে এই বিচার নিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা উঠাতেই বেশি ব্যস্ত।^{২০}

বদরুদ্দীনের উমর তার আরেক বইয়ে লিখেন—

‘জুলফিকার আলি ভুট্টো ছিলেন ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়কার সবচেয়ে ঘৃণিত যুদ্ধাপরাধী। ১৯৭৪ সালে পাকিস্তানের লাহোরে অনুষ্ঠিত ইসলামি সম্মেলনে শেখ মুজিব ভুট্টোকে “আমার প্রিয় পুরোনো বন্ধু” বলে সম্বোধন করে তার গালে চুমু খেয়েছিলেন। সে সম্মেলনের পর শেখ মুজিব ঘৃণ্য যুদ্ধাপরাধী জুলফিকার আলি ভুট্টোকে বাংলাদেশে আসার আমন্ত্রণ জানান। সম্মানিত রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসেবে তাকে রাজকীয় সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন।’^{২১}

মুক্তিযুদ্ধ ইস্যু ভিন্ন মতকে দমন-নিধনের কাজে ব্যবহৃত হওয়ার পাশাপাশি আরও বহুভাবে অপব্যবহারের শিকার হচ্ছে। বহু মুক্তিযোদ্ধা ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে ঘুরে বেড়ায় দ্বারে দ্বারে। আবার অনেকে মুক্তিযুদ্ধ না করেও সুফল ভোগ করে। আবার বহু মুক্তিযোদ্ধা প্রাণপণ যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করে মূল্যায়নও পায়নি। খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সেনাবাহিনীর সাবেক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা মেজর জেনারেল মইনুল হোসেন চৌধুরী-এর এক জেনারেলের নীবর সাক্ষ্য : স্বাধীনতার এক দশক বইটি পড়লে এটা উপলব্ধি করা যায়। বিজয়ের পরের দিন অর্থাৎ ১৯৭১ সালের ১৭ ডিসেম্বর মুক্ত নগরী ঢাকার বিবরণ দিতে গিয়ে তিনি লিখেন—

‘সকালেই স্টেডিয়াম থেকে দেখতে পাই শহরে প্রচুর লোকসমাগম। তাদের অনেকেই অস্ত্রেসস্ত্রে সজ্জিত এবং গাড়ি করে ও পায়ে হেঁটে শহরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। এদের দেখে মনে হয়নি ৯ মাসে কখনো তারা বৃষ্টিতে ভিজেছে বা রোদে ঘেমেছে। তাদের বেশভূষা, চালচলন ও আচরণে যুদ্ধের কোনো ছাপ ছিল না।’^{২২}

^{২০}. বদরুদ্দীন উমর, বাংলাদেশের রাজনীতি, প্রাপ্ত, পৃষ্ঠা : ৬২-৬৪

^{২১}. বদরুদ্দীন উমর, রাজনীতি শিক্ষা সংস্কৃতি, (ঢাকা : কাশবন প্রকাশন, ২০১২), পৃষ্ঠা-১০৪

^{২২}. মেজর জেনারেল মইনুল হোসেন চৌধুরী (অবঃ), এক জেনারেলের নীর সাক্ষ্য : স্বাধীনতার এক দশক, (ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ২০০০), পৃষ্ঠা : ১৭-১৮

যাহোক, নতুন প্রজন্মের কাছে আওয়ামী লীগ এ বার্তা পৌঁছাতে পেরেছে যে, জামায়াতে ইসলামী একটি যুদ্ধাপরাধি দল। ফলে মুক্তিযুদ্ধ ইস্যু জামায়াতের জন্য একটি বড়ো ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখান থেকে আর সহজে বের হতে পারবে না। ১৯৭১ সালে ইসলামি দলগুলো দেশের স্বাধীনতাকামী মানুষজনের আবেগ-অনুভূতি ও মানসিকতা বুঝতে পারেনি। ফলে আজও খেসারত দিতে হচ্ছে। একটি রাজনৈতিক দলের যেকোনো বড়ো সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে, এটা অবশ্যই বিবেচনা করা উচিত যে, দেশের জনগোষ্ঠীর মনোভাব, আবেগ, অনুভূতি এবং ঝোঁক কোনদিকে। যেসব দল মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছে, তারা ১৯৪৭ পরবর্তী ইতিহাসের ধারাবাহিক বিশ্লেষণ করলে অবশ্যই বুঝতে পারত যে, স্বাধীনতার দাবি অনিবার্য পরিণতি লাভ করবে, তা ১৯৭১ সালেই হোক বা তার কিছু পরে। পাকিস্তান নিজেই এই বাস্তবতা তৈরি করেছিল, নিজেদের ব্যর্থতায়। দেশের জনগোষ্ঠীর বড়ো অংশ যেহেতু মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেছে; ইসলামি দলগুলো তখন জনগণের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ না করে নীরব ভূমিকা পালন করতে পারত। নিজের মতের বিপরীত হলেও সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের আবেগ-অনুভূতির বিষয়টি বিবেচনা করে নীরব থাকতে পারত। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা.) সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতকে গুরুত্ব দিয়েছেন। সংখ্যাগরিষ্ঠের আবেগ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। উভূদের যুদ্ধ শুরুর আগে পরামর্শ সভায় জেষ্ঠ সাহাবিরা মদিনার অভ্যন্তরে থেকেই প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পক্ষে সায দিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজেও এ মতের পক্ষে ছিলেন। কিন্তু যারা যুবক, মদিনার প্রান্তরে উন্মুক্ত জায়গায় মোকাবিলা করতে চাইলেন। কেউ কেউ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) আলোচনা শোনার পর তাঁর নিজের মতের বিপক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠের অনুকূলে গিয়েছেন, তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করবেন।^{২০} ঐতিহাসিক ও গুরুত্বপূর্ণ সেই মুহূর্তে রাসূলুল্লাহ (সা.) সংখ্যাগরিষ্ঠের মতের বাইরে যাননি।

মুক্তিযুদ্ধের দায় জামায়াতে ইসলামীর এই প্রজন্মের নেতা-কর্মীদেরও বহন করতে হচ্ছে। ফাঁসি হওয়ার পূর্বে জামায়াতের সহকারি সেক্রেটারি জেনারেল মুহাম্মদ কামারুজ্জামানও এমনটি স্বীকার করে লিখেন—

‘পৃথিবীর অন্য কোনো দেশের ইসলামি আন্দোলনের নেতাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা আন্দোলনে বিরোধিতা করার মতো অতি স্পর্শকাতর কোনো অভিযোগ নেই। এটা স্বীকার করতেই হবে যে, বাংলাদেশের ইসলামি আন্দোলন খুবই সম্ভাবনাময় আন্দোলন হওয়া সত্ত্বেও এই দুর্ভাগ্যজনক ও স্পর্শকাতর অভিযোগ আন্দোলনের রাজনৈতিক সাফল্য ও গ্রহণযোগ্যতার পথে বড়ো বাধার সৃষ্টি করে আছে।’

^{২০}. মেজর জেনারেল (অব.) সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম বীরপ্রতীক, *দ্য ব্যাটেলস অব ইসলাম*, (ঢাকা : অনন্যা প্রকাশনী, ২০০৯), পৃষ্ঠা, ২

দলগতভাবে মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলাম পার্টি, জমিয়তে উলামায়ে ইসলামসহ আরও অনেক দল এবং ব্যক্তিগতভাবে আওয়ামী লীগের অনেক নেতা-কর্মী, এমনকী ১৯৭০ নির্বাচনে বিজয়ী অনেক জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে অবস্থান করলেও দায় এখন প্রধানত বহন করছে জামায়াতে ইসলামী। ১৯৭১ সালের শেষের দিকে ১৯৭০ সালের নির্বাচনের জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের বেশ কিছু আসন শূন্য ঘোষণা করা হয়। এসব আসনে অনুষ্ঠিত হয় ভোটারবিহীন উপনির্বাচন। ঠিক ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির ভোটারবিহীন নির্বাচনের মতো। সেখানে ৭৮টি জাতীয় পরিষদের আসনের মধ্যে ১৮টি এবং ১৭৫ টি প্রাদেশিক আসনের মধ্যে সমন্বিত প্রার্থী তালিকায় জামায়াতের ছিল ৪২ জন।^{২৪} সাংবাদিক মাহমুদ হাসানের বইয়ে দেখা যায়, ৯ নভেম্বর জাতীয় পরিষদের বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিতদের নাম ঘোষণা করা হয় ফলাফল। সে ফলাফলে জাতীয় পরিষদের ৭৮টি শূন্য আসনের উপনির্বাচনে ৫৮ জন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। এদের মধ্যে ১৫ জন জামায়াত, ১২ জন পিডিপি, ২০ জন মুসলিম লীগ, ৬ জন নেজামে ইসলামী, ও ৫ জন পিপিপির প্রার্থী।^{২৫}

এই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিতদের তালিকা অনুযায়ী এটা স্পষ্ট যে, মুক্তিযুদ্ধে বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়নি শুধু জামায়াতে ইসলামী কিংবা ইসলামি দলগুলো। আরও অনেকেও সেদিন মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল। সে উপনির্বাচনে অংশগ্রহণও সেটাই বলে। অন্যদের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা রাজা ত্রিদিব রায় স্বাধীনতাবিরোধী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।^{২৬} আওয়ামী লীগেরও অনেকে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী ভূমিকায় সক্রিয় ছিলেন। গভর্নর আব্দুল মুত্তালিব মালেকের নেতৃত্বে ‘মালেক মন্ত্রিসভা’ গঠিত হয় ১৯৭১ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর। সে মন্ত্রিসভায় জামায়াতের পাশাপাশি অন্যদেরও অংশগ্রহণ ছিল। আওয়ামী লীগেরও অংশগ্রহণ ছিল। সে মন্ত্রিসভার সদস্য খেলাফত মজলিসের বর্তমান আমির মাওলানা মোহাম্মাদ ইসহাক এখনও রাজনীতিতে সক্রিয়। অন্যরা সবাই মারা গেছেন।

মালেক মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দ

নাম	দল	মন্ত্রণালয়	জেলা
আবুল কাশেম	কাউন্সিল মুসলিম লীগ	অর্থ মন্ত্রণালয়	রংপুর
নওয়াজেশ আহমেদ	কাউন্সিল মুসলিম লীগ	খাদ্য, কৃষি, তথ্য	কুষ্টিয়া
এএসএম সোলায়মান	বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক পার্টি	শ্রম, সমাজকল্যাণ, পরিবার পরিকল্পনা	ঢাকা

^{২৪}. আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন, প্রবন্ধ : মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীনতা বিরোধী শক্তির তৎপরতা, *বাংলা ও বাঙালির ইতিহাস চতুর্থ খণ্ড*, অজয় রায় সম্পাদিত, (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০১২), পৃষ্ঠা, ৪৩২

^{২৫}. মাহমুদ হাসান, *দিনপঞ্জি একাত্তর*, (ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ২০১৩), পৃষ্ঠা, ২৫৭-৫৮

^{২৬}. আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা, ৪৩৬

মো. ওবায়দুল্লাহ মজুমদার	আওয়ামী লীগ (১৯৭০ সালের নির্বাচনে বিজয়ী জাতীয় পরিষদ সদস্য- এমএনএ)	স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়	নোয়াখালী
অধ্যাপক শামসুল হক	আওয়ামী লীগ (৭০-এর নির্বাচনে বিজয়ী প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য- এমপিএ)	সাহায্য ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়	চট্টগ্রাম
আব্বাস আলী খান	জামায়াতে ইসলামী	শিক্ষা মন্ত্রণালয়	বগুড়া
মওলানা একেএম ইউসুফ	জামায়াতে ইসলামী	রাজস্ব, পূর্ত, বিদ্যুৎ	খুলনা
মওলানা মোহাম্মদ ইসহাক	নেজামে ইসলাম পার্টি (খেলাফত মজলিসের বর্তমান আমির)	স্থানীয় সরকার, স্বায়ত্বশাসন, মৌলিক গণতন্ত্র	পাবনা
আখতারুদ্দিন আহমেদ	কনভেনশন মুসলিম লীগ	শিল্প, বাণিজ্য, আইন	বরিশাল
অংশু প্রা চৌধুরী ^{২৭}	পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি নেতা	সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	পার্বত্য চট্টগ্রাম
একেএম মোশাররফ হোসেন	পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি- পিডিপি		
জসিম উদ্দিন আহমদ	পিডিপি		
মুজিবুর রহমান	পিডিপি		

প্রথমে ১০ জন নিয়ে মালেক মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। ৭ অক্টোবর সম্প্রসারিত হয় এবং আরও তিনজন অন্তর্ভুক্ত হন। সারণির শেষের ৩ জন ৭ অক্টোবর মন্ত্রিপরিষদে অন্তর্ভুক্ত হন। প্রথম ১০ জন ১৭ সেপ্টেম্বরেই অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন।

মালেক মন্ত্রিসভার ১৩ সদস্যের মধ্যে জামায়াতে ইসলামীর দুইজন। বাকি ১১ জন অন্য দল, মত ও সম্প্রদায়ের। অন্যদিকে, জাতীয় পরিষদের ৭৮টি শূন্য আসনে অংশগ্রহণকারী এবং ৯ নভেম্বর বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ঘোষিতদের মধ্যে জামায়াতে ইসলামীর ১৫ জন ছাড়া বাকিরা আওয়ামী লীগ, মুসলিম লীগ, পিডিএম, নেজামে ইসলাম পার্টিসহ অন্য দলের। তাহলে বোঝা যায়,

^{২৭}. বান্দরবানের বোমাং রাজপরিবারের ১৫তম রাজা হলেন অংশু প্রা চৌধুরী। জিয়াউর রহমান সরকারের খাদ্য ও সান্ত্বনার সরকারের সময় প্রতিমন্ত্রী ছিলেন। তার ছেলে বিএনপি সরকারের সাবেক এমপি সাচিং প্রা জেরি বান্দরবান জেলা বিএনপির সভাপতি। অংশু প্রা চৌধুরী মারা যান ২০১২ সালে।

মুক্তিযুদ্ধ বিরোধিতায় জামায়াতের সাথে অন্যদেরও সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল। মালেক মন্ত্রীপরিষদে জামায়াতের অংশগ্রহণ ছিল প্রায় ১৫%। বিরোধিতার বাকি ৮৫% অন্যদের। কিন্তু জামায়াতের বিরুদ্ধে প্রচার-প্রচারণা এমনভাবে অব্যাহত আছে যে, মুসলিম লীগ, পিডিএম, পিপিপি, নেজামে ইসলাম পার্টিসহ আর কেউ যেন বিরোধিতা-ই করেনি। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ২০১৩ সালে যখন জামায়াতে ইসলামীর নেতা মাওলানা একেএম ইউসুফ^{২৮} অন্য আরও কয়েক জামায়াত নেতার সঙ্গে যুদ্ধাপরাধ মামলায় জেলে, সে সময় বহুল প্রচারিত একটি জাতীয় দৈনিকের একটি প্রতিবেদন এরকম ছিল, জামায়াতে ইসলামীর একেএম ইউসুফ ছাড়া মালেক মন্ত্রিসভার আর কেউ জীবিত নেই।^{২৯} একেএম ইউসুফ এর কিছুদিন পর মারা গেলেও মাওলানা ইসহাক^{৩০} এখনও (ফেব্রুয়ারি-২০১৯) জীবিত আছেন।

জামায়াতে ইসলামী যে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা যে করেছে, সেটা এড়িয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। মালেক মন্ত্রিসভায় যোগদান করে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ ও মিন্টো রোডের বাসায় থাকা, উপনির্বাচনে অংশগ্রহণ ইত্যাদি বিষয় অস্বীকার করার কোনোই সুযোগ নেই। যেহেতু ১৯৭১ সালের উপনির্বাচন অনেকটা ২০১৪ সালের ৫ই জানুয়ারির স্টাইলে হয়েছে, সেহেতু ভোটাবিহীন সে উপনির্বাচনে ৫ই জানুয়ারির নির্বাচনের আরও কিছু বিষয়ের মিলও পাওয়া যায়। সেদিন জামায়াতে ইসলামীর মাওলানা আব্দুর রহীম এরশাদীয় স্টাইলে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। এই রাজনীতিবিদ ও ইসলামিক স্কলার যেমন জামায়াতে ইসলামীর সেনা-অভিযান, শান্তি কমিটিতে যোগদানের বিরোধী ছিলেন; তেমনি উপনির্বাচনেও অংশগ্রহণের বিরোধী ছিলেন। দলীয় সিদ্ধান্ত হওয়ার পরও নিজে সে উপনির্বাচনের সুযোগভোগী জাতীয় পরিষদ সদস্য হতে চাননি।

কিন্তু পাকিস্তান সেনাবাহিনী তাঁর অজ্ঞাতে তথাকথিত সে উপনির্বাচনে তাকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ঘোষণা করে।^{৩১} যেটা ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির নির্বাচনে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান এরশাদের ক্ষেত্রে হয়েছিল।^{৩২} মাওলানা আব্দুর রহীম স্পষ্টই বুঝতে পারছিলেন যে, এসব কিছুই হচ্ছে সাজানো নাটক। এ ভূখণ্ডে পাকিস্তান নামটির কোনো অস্তিত্ব থাকবে না।

^{২৮}. ১৯৭১ সালে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে আটক জামায়াতের নায়েবে আমির এ.কে. এম ইউসুফ জেলে থাকাকালীন ২০১৪ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান।

^{২৯}. বাংলাদেশ প্রতিদিন, ২০ অক্টোবর ২০১৩

^{৩০}. মাওলানা মোহাম্মদ ইসহাক ১৯৭১ সালে নেজামে ইসলাম পার্টির নেতা হলেও এখন খেলাফত মজলিসের একটা অংশের আমির। তাঁর দল নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধিত।

^{৩১}. এসএম সাখাওয়াত হুসাইন, *ইসলামি রাজনীতিতে মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম*, দৈনিক ইনকিলাব, অক্টোবর ১, ২০১৬

^{৩২}. ৫ জানুয়ারির এক-তরফা নির্বাচন চাননি এরশাদ। বাসায় পিস্তল নিয়ে বসে ছিলেন এবং ঘোষণা দিয়েছিলেন, কেউ যদি তাকে জোর করে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করাতে চায়, পিস্তল দিয়ে আত্মহত্যা করবেন। তার স্ত্রী রওশন এরশাদকে হাত করে ফেলা হয়। রয়াব এরশাদকে জোর করে হাসপাতালে ভর্তি করে দেয়। সিএমএইচ থেকে নমিনেশন পেপার সাবমিট করানো হয় তিনটি আসনে। এরশাদ পরে নমিনেশন প্রত্যাহারের ঘোষণা দেন। আবেদনও করেন। এর মধ্যে নির্বাচনও হয়ে যায়। পরে দেখা গেল, যে আসনের নমিনেশন প্রত্যাহার করেছেন, সে আসনে জিতেছেন এবং যে আসনে প্রত্যাহার করেননি, সে আসনে হেরেছেন। সিএমএইচ থেকে সংসদে এসে শপথও নেন।

সেনাবাহিনীও আসলে এ অঞ্চলকে পাকিস্তানভুক্ত রাখতে চাইছে না; বরং ২৫ মার্চ সেনাবাহিনীর কার্যব্যবস্থা গ্রহণের পর বাংলাদেশের অভ্যুদয় শুধু সময়ের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাই শান্তি কমিটির কোনো কোনো কর্মকর্তাকে ব্যক্তিগতভাবে ডেকে তিনি বিষয়টি বোঝানোর চেষ্টা করলেন। কিন্তু অত্যাচারী নেতারা তাঁর কথার মর্ম বুঝতে চাইলেন না; বরং কেউ কেউ উলটো তাঁকে ভুল বুঝলেন। এমনকী, কেউ কেউ তাঁর মধ্যে দূরদৃষ্টির অভাবও খুঁজে বের করলেন।^{৩৩}

জামায়াতে ইসলামীর এই দায় বহন করার পেছনে তাদের ১৯৭১ সালের সিদ্ধান্ত পাশাপাশি পরবর্তী সময়ের সিদ্ধান্তও দায়ী। জামায়াতে ইসলামীর সাথে মিলিটারির বা জুলফিকার আলি ভুট্টোর সম্পর্ক ভালো ছিল না। দলটি গণতান্ত্রিক আন্দোলনেই ছিল। সে অবস্থান থেকে সরে এসে মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ, উপনির্বাচনে অংশগ্রহণ এবং মালেক মন্ড্রিসভায় যোগদানের কারণ কী? তারপরও একাত্তরপরবর্তী সময়ে তারা যদি মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কাজ করত, গবেষণা করত, বিষয়টি মাথায় রেখে এগোতো; তাহলে অনেকটা দায় এড়াতে পারত। অন্যদিকে আওয়ামী বিরোধীরা দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকলেও মুক্তিযুদ্ধে আওয়ামী লীগের ভূমিকার সর্বসাকুল্য খতিয়ান তৈরি করতে মনযোগী হয়নি। স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন সময়ে মুক্তিযুদ্ধের নামে অনেকের বিতর্কিত ভূমিকা নিয়ে কোনো রিসার্স তারা সরকারিভাবে নথিভুক্ত করেনি। মেজর জলিল, বদরদ্দিন উমর, আহমদ হুফাদের একাডেমিক গবেষণাগুলোকে তারা প্রতিষ্ঠানিক রূপ দিতে পারত। করেনি। চিন্তাও করেনি। এখন দেখা যায় যে, অনেক সময় অনেক মুক্তিযোদ্ধা রাজাকার বনে যাচ্ছেন। আবার কোনো কোনো রাজাকারও মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের শক্তি হয়ে উঠছেন। নোয়াখালী থেকে নির্বাচিত আওয়ামী লীগের এমএনএ (জাতীয় পরিষদ সদস্য) মো. ওবায়দুল্লাহ মজুমদার এবং চট্টগ্রাম থেকে নির্বাচিত অধ্যাপক শামসুল হক দুজনই ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় মালেক মন্ড্রিসভার সদস্য ছিলেন। আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত আওয়ামী লীগের কমপক্ষে আরও ২৫-৩০ নির্বাচিত নেতা পাক হানাদার বাহিনীর সঙ্গে হাত মেলান। অন্য দলের অনেকে সামরিক জান্তার পাশে ছিলেন কিংবা আশীর্বাদ পেতে চেষ্টা করেছেন। পাকিস্তানের পিপলস পার্টির (পিপিপি) একটি প্রতিনিধিদল ঢাকা সফরে এলে ১৯৭১ সালের ১২ অক্টোবর, স্থানীয় একদল রাজনৈতিক নেতা হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে (আজকের হোটেল সোনারগাঁও) তাদের সাথে সাক্ষাৎ করে পিপিপিতে যোগদান এবং পিপিপির টিকিটে সংসদের উপনির্বাচনে অংশ নেওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। এদের মধ্যে ছিলেন পিডিপির সাবেক প্রাদেশিক পরিষদ প্রধান আব্দুস সালাম খান, কাইয়ুম মুসলিম লীগের কাজী কাদের, ন্যাপ (ওয়ালি) নেতা আহমেদুল কবির^{৩৪} ও মিয়া মনসুর আলি প্রমুখ।^{৩৫}

^{৩৩}. এসএম সাখাওয়াত হুসাইন, ইসলামি রাজনীতিতে মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, দৈনিক ইনকিলাব, অক্টোবর ১, ২০১৬

^{৩৪}. আহমেদুল কবির দৈনিক সংবাদের প্রধান সম্পাদক ও গণতন্ত্রী পার্টির সভাপতি ছিলেন। ১৯৪৫-৪৬ সালে ডাকসুর ভি.পি ছিলেন। ১৯৬৫ সালে ন্যাপের প্রার্থী হিসেবে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। নরসিংদী-২ আসন থেকে ১৯৭৯ ও ১৯৮৬ সালেও এমপি নির্বাচিত হন। মারা যান কয়েক বছর আগে

^{৩৫}. মাহমুদ হাসান, দিনপঞ্জি একাত্তর, (ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ২০১৩), পৃষ্ঠা-২৪৪

১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল শেরে বাংলার পুত্র এবং ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের টিকিটে নির্বাচিত জাতীয় পরিষদের সদস্য এ.কে. ফয়জুল হক^{৩৬} পাকিস্তানকে দ্বিখণ্ডিত করার কোনো পরিকল্পনার সাথে শরিক হতে পারেন না বলে এক বিবৃতিতে জানান। তিনি সেই বিবৃতিতে সবাইকে পাকিস্তান অখণ্ড রাখার আহ্বান জানান। ওইদিনই শেরে বাংলার কন্যা জমিয়াতুল ইসলামিয়ার সভানেত্রী রইসি বেগম ঢাকায় পৃথক এক বিবৃতিতে পাকিস্তানকে অখণ্ড রাখার পক্ষে কথা বলেন। তিনি শেখ মুজিবুর রহমানেরও কড়া সমালোচনা করেন।^{৩৭} শেখ মুজিবুর রহমানের নেতা এবং আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী তনয়া বেগম আখতার সোলায়মান (ডাক নাম বেবি) ২১ এপ্রিল করাচি থেকে বিবৃতি দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেন।^{৩৮} তিনি পরে ঢাকায় এসে মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে কাজ করেন।

১৯৭১ সালে ভারতে অনেক বাঙালি যুবককে ট্রেনিং দিয়ে অস্ত্র দেওয়া হতো মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য। আওয়ামী লীগের যুবকরা ট্রেনিংতে স্থান পেত। মুক্তিযোদ্ধাদের বৃহত্তর অংশ পরবর্তীকালে লড়াই থেকে সম্পূর্ণ দূরে সরে থাকে। এমনকী কোনো কোনো ক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ অপেক্ষা গ্রামীণ বিবাদ ও ব্যক্তিগত রেষারেষির নিষ্পত্তিতে, এমনকী সরাসরি লুটতরাজে অংশগ্রহণ করে।^{৩৯} এদিকে মুক্তিযুদ্ধের স্বার্থপর একটা গ্রুপ স্বার্থের জন্য ভারতের মাটিতে অনেক অপ্রীতিকর কাজ করে। মুক্তিযুদ্ধের সময় এসব আওয়ামী মুক্তিযোদ্ধারা ভারতে তাজউদ্দিনের প্রাণনাশ করারও চেষ্টা করে।^{৪০} এসব কিছু জানে না এই প্রজন্ম। এই নতুন প্রজন্ম শুধু জানে, কিছু ইসলামি দলের লোকজন কীভাবে ১৯৭১ সালে তাগুবতা চালিয়েছে। এটা আওয়ামী লীগেরই ক্রেডিট। তারা এটা করতে পেরেছে। ইসলামপন্থীরা এ জানানোর কাজ সঠিকভাবে করতে পারেনি। ইসলামপন্থীরা মুক্তিযুদ্ধ বিরোধিতা করার কলঙ্কের বোঝা নিয়ে বহুদূরের পথ পাড়ি দিচ্ছে।

সাতচল্লিশের দেশভাগ ইস্যু

ইংরেজদের খেদিয়ে ভারত ও পাকিস্তান নামে আলাদা দুটো জাতিরাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে। শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হকের উত্থাপিত লাহোর প্রস্তাব আর মোহাম্মদ আলি জিন্নাহর দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হয়। দ্বি-জাতিতত্ত্ব ইস্যুতে মুসলিম সমাজ বিভক্ত হয়ে পড়ে। ইসলামপন্থীদের মধ্যে দেখা দেয় বিভাজন। সেই বিভাজনের মধ্য দিয়ে তাদের মধ্যে যে তিক্ততা, একে অন্যের বিরুদ্ধে যে অবস্থান তৈরি হয়; পাকিস্তানের রাষ্ট্রের যাত্রা শুরু হয়ে গেলেও

^{৩৬}. শেরে বাংলার ছেলে এ.কে. ফয়জুল হক ১৯৯৬-২০০১ তে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকারের পাট প্রতিমন্ত্রী ছিলেন

^{৩৭}. মাহমুদ হাসান, *দিনপঞ্জি একাত্তর*, (ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ২০১৩), পৃষ্ঠা-১২২

^{৩৮}. মাহমুদ হাসান, *দিনপঞ্জি একাত্তর*, (ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ২০১৩), পৃষ্ঠা-১৩৮

^{৩৯}. মঈদুল হাসান, *মূলধারা*: '৭১, (ঢাকা : দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৫) পৃষ্ঠা-৩৪

^{৪০}. মঈদুল হাসান, *মূলধারা*: '৭১, পৃষ্ঠা-১৫৩

সে তিক্ততা আর পারস্পরিক বিরোধিতা দিন দিন আরও বৃদ্ধি পায়। মাওলানা মওদুদী ও জামায়াতে ইসলামীর সাথে দেওবন্দি আলেমদের বিরোধিতা আরও তীব্র হয় ‘এক-জাতি তত্ত্ব’ ও ‘দ্বি-জাতি তত্ত্ব’ ইস্যুতে। দেওবন্দি আলেমদের মধ্যেও এই ইস্যুতে বিভক্তি ঘটে এবং ১৯৪৫ সালে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দে এই কারণে প্রথম ভাঙন ধরে। দেওবন্দি আলেমদের একটা অংশ হিন্দুদের নিয়ন্ত্রিত কংগ্রেসের প্রতি দুর্বল ছিলেন। জমিয়তের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান ১৯২০ সালে কারাগার থেকে বের হয়ে দেশ স্বাধীন করার নিমিত্তে হিন্দুদের নেতৃত্বের পর্যায়ে নিয়ে আসার প্রস্তাব করেন। শায়খুল হিন্দের উক্ত প্রস্তাবনার মাধ্যমেই মতিলাল নেহেরু ও গান্ধীজিকে নেতৃত্বে নিয়ে আসা হয়।^{৪১}

সামগ্রিকভাবে মুসলিমরা কংগ্রেসে যোগদানের ব্যাপারে ছিল দ্বিধাশ্রিত। অল ইন্ডিয়া ন্যাশনাল কংগ্রেসের প্রধান চালিকাশক্তি ছিলেন জাওহারলাল নেহরু। তিনি বলেন, মুসলিমদেরকে আলাদা জাতি গণ্য করার অর্থ দাঁড়াবে একজাতির ভেতর আরেক জাতির অস্তিত্ব মেনে নেওয়া। তিনি ছিলেন সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী। ধর্ম-কর্মকে কুসংস্কার গণ্য করতেন। এসময় সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী অল ইন্ডিয়া ন্যাশনাল কংগ্রেসের আদর্শ জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও সেক্যুলার গণতন্ত্রের সমালোচনা করেন। জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ কংগ্রেসের রাজনীতির সমর্থকে পরিণত হওয়ায় তিনি এই সংস্থারও সমালোচনা করেন। পাকিস্তান রাষ্ট্রের স্বপ্নদ্রষ্টা মহকবি ইকবাল মওদুদীকে খুব পছন্দ করতেন। মাওলানা মওদুদীর লেখায় যখন এমনটি ফুটে উঠছে, আর ইকবাল পাকিস্তানের স্বপ্ন দেখে এগোচ্ছেন তখন মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানি^{৪২} ও তাঁর দল জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ কংগ্রেসের একজাতি তত্ত্বের পক্ষে জোরাল অবস্থান গ্রহণ করেন। ১৯৩৮ সালে হুসাইন আহমাদ মাদানি *মুত্তাহিদা কাওমিয়াত* বই লিখে মুসলিমদের বোঝাতে চান যে, হিন্দু-মুসলিম মিলে একজাতি হওয়াতে এবং একত্রে কাজ করাতে কোনো দোষ নেই। তিনি তাঁর বইতে লিখেন—

‘আমরা প্রতিদিন সম্মিলিত স্বার্থের জন্য সংঘ বা সমিতি গঠন করে থাকি এবং তাতে শুধু অংশগ্রহণ করি না; বরং সদস্যপদ লাভ করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টাও করে থাকি। শহর এলাকা, বিশেষ এলাকা, মিউনিসিপ্যাল বোর্ড, জেলাবোর্ড, ব্যবস্থা পরিষদ, শিক্ষা সমিতি এবং এই ধরনের শত শত সমিতি রয়েছে যা বিশেষ উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট নিয়মনীতি অনুযায়ী গঠিত। এইসব সমিতিতে অংশগ্রহণ করা এবং সেই জন্য পূর্ণভাবে কিংবা আংশিকভাবে

^{৪১}. মাও. উবাইদুল্লাহ ফারুক, *অসচেতনতা ও উদাসীনতাই আমাদের সর্বনাশের মূল কারণ* (প্রবন্ধ), সেমিনার স্মারক, জামিয়া আব্দুর মোহাম্মদ মাদ্রাসা, সিলেট, ২০০৩, পৃষ্ঠা, ১০১

^{৪২}. মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানি প্রসিদ্ধ ইসলামিক স্কলার ছিলেন। জন্ম ১৮৭৯ সালে, মৃত্যু ১৯৫৭ সালে। জমিয়ত উলামায়ে হিন্দের সভাপতি ছিলেন দীর্ঘ দিন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এই পদে ছিলেন। দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রধান মুহাদ্দিস ও প্রতিষ্ঠানপ্রধান পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এর আগে সিলেট, কলকাতাসহ বিভিন্ন জায়গায় শিক্ষকতা করেন। ভারতের উত্তর প্রদেশে জনগুরুত্বপূর্ণ এই আলেমের প্রভাব ছিল মুসলিমদের একটি অংশের ওপর। বিশেষত উত্তর প্রদেশ ও বিহারের মুসলিমদের ওপর।

চেষ্টা করাকে কেউ নিষিদ্ধ বলে না। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়, এই ধরনের কোনো সমিতি যদি দেশের স্বাধীনতা অর্জন ও ব্রিটিশ প্রভুত্বের বিরুদ্ধে কাজ করার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তাতে অংশগ্রহণ করা হারাম, ন্যায়পরায়নতার খেলাফ, ইসলামি শিক্ষার পরিপন্থি ও জ্ঞান-বুদ্ধির বিপরীত হয়ে যায়।^{৪৩}

এক-জাতি তত্ত্বের অসারতা প্রমাণ করে জাতীয়তাবাদের প্রশ্নে মুসলিমরা যাতে চিন্তার বিভ্রান্তির শিকার না হয় সেজন্য সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী লিখেন,

‘ইসলামি জাতীয়তায় মানুষে মানুষে পার্থক্য করা হয় বটে, কিন্তু জড়, বৈষয়িক ও বাহ্যিক কোনো কারণে নয়। এটা করা হয় আধ্যাত্মিক নৈতিক ও মানবিকতার দিক দিয়ে। মানুষের সামনে এক স্বাভাবিক সত্য-বিধান পেশ করা হয়েছে, যার নাম ইসলাম। আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্য, হৃদয় মনের পবিত্রতা-বিশুদ্ধতা, কর্মের অনাবিলতা, সততা ও দ্বীন অনুসরণের দিকে গোটা মানবজাতিকে আহ্বান জানানো হয়েছে। তারপর বলা হয়েছে, ‘যারা এই আহ্বান গ্রহণ করবে তারা একজাতি হিসেবে গণ্য হবে। আর যারা তা অগ্রাহ্য করবে তারা ভিন্ন জাতির অন্তর্ভুক্ত হবে। অর্থাৎ মানুষের একটি হচ্ছে ঈমান ও ইসলামের জাতি। তারা ব্যক্তি সমষ্টি মিলে একটি উম্মাহ। মানুষের অন্যটি হচ্ছে কুফর ও ভ্রষ্টতার জাতি। তারা পারস্পরিক মত-বিরোধ ও বৈষম্য সত্ত্বেও একই দল।’

তিনি আরও লিখেন—

‘এই দুইটি জাতির মধ্যে বংশ ও গোত্রের দিক দিয়ে কোনো পার্থক্য নেই। পার্থক্য বিশ্বাস ও কর্মের। কাজেই একই মা-বাবার দুই সন্তান ইসলাম ও কুফরের উল্লেখিত পার্থক্যের কারণে স্বতন্ত্র দুই জাতির মধ্যে গণ্য হতে পারে এবং দুই নিঃসম্পর্ক ও অপরিচিত ব্যক্তি ইসলামে প্রবেশ করার কারণে এক জাতির অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে।... জন্মভূমির পার্থক্যও এই উভয় জাতির ব্যবধানের কারণ হতে পারে না।... একই শহর একই মহল্লা ও একই ঘরের দুই ব্যক্তির জাতীয়তা ইসলাম ও কুফরের পার্থক্যের কারণে বিভিন্ন হতে পারে। একজন নিগ্রো ইসলামের সূত্রে একজন মরক্কোবাসীর ভাই হতে পারে।’

মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানির বই প্রকাশের পর আল্লামা ইকবালও প্রতিক্রিয়া দেখান। এক-জাতিতত্ত্ব ও দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ইসলামপন্থীদের মধ্যকার এই দূরত্ব গণতান্ত্রিক পর্যায়ে না থেকে হিংসা-বিক্ষেপে রূপ নেয়। বিভক্তি ঘটে।

মুসলিম লীগের দ্বি-জাতিতত্ত্ব ভিত্তিক আন্দোলন শুরুতে দুর্বল হলেও পরে শক্তিশালী অবস্থান গ্রহণ করে। আমাদের বাংলাদেশের, তখনকার পূর্ববঙ্গের জনগণের ব্যাপক সমর্থন ছিল পাকিস্তান নামে আলাদা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রতি। বলা চলে, পাকিস্তানের অপরাপর প্রদেশের চাইতে পূর্ব বাংলার ভূমিকা ছিল বেশি।

^{৪৩}. মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানি, মুত্তাহিদা কাউমিয়াত, পৃষ্ঠা-৫২

যে মুসলিম লীগ পাকিস্তান আন্দোলন পরিচালনা করে এবং সফল হয়, সেই মুসলিম লীগের জন্ম-ই তো ঢাকায়। ঢাকাকেন্দ্রিক মুসলিম লীগের শক্তিও ছিল বেশি। পূর্ব বাংলা থেকে পাকিস্তানের পক্ষে চাপও যেত বেশি। তার একটি উদাহরণ হচ্ছে, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের আইনসভায় মুসলিম লীগ থেকে নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে দিল্লিতে একটি সম্মেলন ডাকলেন জিন্নাহ ১৯৪৬ সালের ৭ এপ্রিল। সে সম্মেলনে বাংলার নব নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী (মুসলিম লীগ থেকে নির্বাচিত একমাত্র প্রধানমন্ত্রী) এক জ্বালাময়ী ভাষণে বলেন—

‘এই বিরাট ভারতবর্ষে ১০ কোটি মুসলমান এমন একটি ধর্মমতে বিশ্বাসী যা নিয়ন্ত্রণ করছে তাদের শিক্ষা, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবন।..আমি এখন সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করতে চাই, পাকিস্তান অর্জনে বাংলার প্রতিটি মুসলমান জীবন উৎসর্গ করার জন্য তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছে। জনাব জিন্নাহ, আপনাকে আমি আহ্বান করছি, আসুন, আমাদের পরীক্ষা করে দেখুন।’^{৪৪}

দিল্লী সম্মেলনে এ প্রস্তাবটি ছিল লাহোর প্রস্তাবের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশিম আপত্তি জানিয়ে বলেছিলেন,

‘মাঝখানে একটা বিরাট শত্রুভাবাপন্ন দেশের অবস্থানের কারণে পাকিস্তানের উভয় অংশ বিচ্ছিন্ন থাকবে এবং এই রাষ্ট্রকে রক্ষা করা প্রায় অসম্ভব হবে।’^{৪৫}

লাহোর প্রস্তাবে আলাদা রাষ্ট্রের যে বিষয়টি ছিল, সেটি ছিল মুসলিম অধুষিত অঞ্চল নিয়ে দুটো রাষ্ট্র গঠনের বিষয়। লাহোর প্রস্তাব ছিল ভারতীয় মুসলমানদের আবাসভূমি হিসেবে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহ গঠনের জন্য আন্দোলনের ভিত্তি।

ভারতীয় মুসলমানদের আবাসভূমি হিসেবে দুটো স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের একটি হলো, পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও কাশ্মীর নিয়ে গঠিত উত্তর-পশ্চিম ভারতে, অন্যটি বাংলা ও আসাম নিয়ে গঠিত উত্তর-পূর্ব ভারতে।^{৪৬} ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব এক পাকিস্তানের কথা চিন্তা করেনি, চিন্তা করেছিল ভারতীয় মুসলমানদের জন্য দুটো স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের কথা।^{৪৭}

এদিকে তখন বাংলাকে নিয়ে আলাদা রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা কিছুটা জোরালোও হয়। ১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মুসলিম নেতা আবুল হাশিম ও কংগ্রেস নেতা শরৎচন্দ্র বসু সার্বভৌম অঞ্চল বাংলার পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করছিলেন। এ নিয়ে কলকাতায় সোহরাওয়ার্দীর বাসায়

^{৪৪}. মহিউদ্দিন আহমদ, *আওয়ামী লীগ : উত্থান পর্ব ১৯৪৮-১৯৭০*, (ঢাকা : প্রথম প্রকাশন, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০১৭), পৃষ্ঠা, ১৭-১৮, কামরুদ্দিন আহমদ, *পূর্ব বাংলার সমাজ ও রাজনীতি*, (ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স), পৃষ্ঠা : ৬৮-৬৯

^{৪৫}. মহিউদ্দিন আহমদ, *আওয়ামী লীগ : উত্থান পর্ব ১৯৪৮-১৯৭০*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা, ১৮

^{৪৬}. আবুল হাশিম, *আমার জীবন ও বিভাগপূর্ব বাংলাদেশের রাজনীতি*, (কলকাতা : চিরায়ত প্রকাশন, ১৯৭৮), পৃষ্ঠা, ৩৪

^{৪৭}. আবুল হাশিম, *আমার জীবন ও বিভাগপূর্ব বাংলাদেশের রাজনীতি*, (কলকাতা : চিরায়ত প্রকাশন, ১৯৭৮), পৃষ্ঠা,

মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস নেতাদের একটি কমিটি করা হয়। ১২ মে হাশিম ও শরৎ গান্ধীর সাথে দেখা করে সার্বভৌম বাংলার কথা জানান। পরে শরৎচন্দ্র বসুর লেখা এক চিঠির জবাবে গান্ধী জুলাই মাসে পণ্ডিত নেহেরু ও সরদার প্যাটেলের মতামত জানিয়ে বলেন, ‘বঙ্গদেশ বিভক্তি জন্য পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, তাকে বন্ধ না করাই ভালো।’^{৪৮}

বোঝাই যাচ্ছে, মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে বিশেষ করে বাংলাদেশ বা পূর্ব বাংলা অংশে দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলন বেশ শক্তিশালী ছিল। অন্যদিকে, দেওবন্দি আলেমরা এর বিরোধী ছিলেন। এ থেকে বিরোধ চলে আসছে, যা ইসলামি রাজনৈতিক দলগুলোর সফলতার পেছনে অন্য কথায় তাদের নিজদের মধ্যে বিরোধ ও অনৈক্য সৃষ্টিতে একটা কারণ বলা যায়।

ডিম পাড়ে হাঁসে, খায় বাগডাসে (ঐতিহাসিক মূহুর্তে ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ)

কথায় বলে, ‘খায় দায় ফজর আলি, মোটা হয় জব্বার।’ এজাতীয় আর একটি প্রবাদ আছে, ‘ডিম পাড়ে হাঁসে, খায় বাগডাসে।’ আমাদের দেশের ইসলামপন্থী দলগুলোর অবস্থা এই ফজর আলি কিংবা হাঁসের মতো। আর আওয়ামী লীগ-বিএনপি জব্বার কিংবা বাগডাস।^{৪৯} অর্থাৎ ইসলামি দলগুলোর আন্দোলন সংগ্রামের ফলাফল ভোগ করে আওয়ামী লীগ কিংবা বিএনপি কিংবা তো জাতীয় পার্টি। শেখ মুজিবুর রহমান প্রথম মন্ত্রী হন ইসলামপন্থীদের ভূমিকায়। আইয়ুববিরোধী আন্দোলন, শেখ মুজিবুর রহমানের ছয় দফার আন্দোলন, ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থান, সত্তরের নির্বাচন আদায় এবং একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের ক্ষেত্র তৈরিতে ইসলামি দলগুলোর ভূমিকা অন্যান্য গণতান্ত্রিক দলগুলোর চাইতে কম নয়। জিয়াউর রহমান বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রবর্তন করে ইসলামি রাজনৈতিক দলগুলোর রাজনীতির পথ সুগম করে দিলেও এর সুফল তিনি নিজেও ভোগ করেন। বিএনপিকে ক্ষমতা থেকে নামিয়ে ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় আনার প্রধান সহযোগী শক্তি ছিল জামায়াতে ইসলামী। বিভিন্ন ইস্যুতে ইসলামপন্থীদের ভূমিকা ও বিনিময়ে উলটো ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার একটা বিবরণ দেওয়া যাক।

ভাষা আন্দোলন ও তমদুন মজলিস : একাত্তরের স্বাধীনতা সংগ্রামের বীজ বপিত হয় ভাষা আন্দোলনে। ১৯৪৮ সালে এ আন্দোলন শুরু হয়। ভাষা আন্দোলনে চূড়ান্ত পর্যায়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ভূমিকা বেশি। আর এই ভাষা আন্দোলনের সূচনায়, এর যৌক্তিক ভিত্তি

^{৪৮}. মহিউদ্দিন আহমদ, *আওয়ামী লীগ : উত্থান পর্ব ১৯৪৮-১৯৭০*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা, ২০-২১, কামরুদ্দিন আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা, ৮২

^{৪৯}. বাগডাস (Large Indian Civet) হলুদ বা বাদামি আঁচ এবং কালো পটি ও ডোরা সম্বলিত ধূসর নিঃসঙ্গ নিশাচর ছোটো একটি স্তন্যপায়ী প্রাণী। বাংলাদেশে এ প্রাণী খুবই কম। ভারতের উত্তরাঞ্চল, নেপাল, ভুটান, মায়ানমার চীনের দক্ষিণাঞ্চল, থাইল্যান্ড ও মালয়েশিয়ায় আছে। হাঁস-মুরগীর ডিম হচ্ছে বাগডাসের প্রিয় খাবার। গৃহকত্রী হাঁস পোষে ডিমের জন্য। কিন্তু কৌশলে বাগডাস খেয়ে ফেলে। গৃহকত্রীর আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং কষ্টের ফলাফল শেষ করে দেয়।

ও কাঠামো গড়ে তোলার ক্ষেত্রে, প্রচার ও প্রসারে, জনমত গঠনে যে সংগঠনটি সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখে সেটা হচ্ছে তমদুন মজলিস। তমদুন মজলিস একটি ইসলামিক সাংস্কৃতিক সংগঠন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তখনকার তরুণ অধ্যাপক প্রিন্সিপাল আবুল কাসেম, অধ্যাপক শাহেদ আলী, অধ্যাপক গোলাম আযম, আব্দুল গফুর প্রমুখ তমদুন মজলিসের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। তমদুন মজলিসের আন্দোলনের ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রভাষার দাবি আদায় হলেও পরবর্তী সময়ে এ আন্দোলনের চেতনা ও ধারাবাহিকতা অন্যরা কাজে লাগিয়েছে, ইসলামপন্থীরা নয়।

৫৪'র যুক্তফ্রন্ট সরকার ও শেখ মুজিবের মন্ত্রিত্ব : ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের পর অল্প বয়সে মন্ত্রী হন শেখ মুজিবুর রহমান। তাকে মন্ত্রী বানানোর পেছনে ইসলামপন্থীদেও ভূমিকা রয়েছে। আর এই ইসলামপন্থীরা রাজনৈতিক ভুলের কারণে শেখ মুজিবুরের আমলে নিষিদ্ধ থাকেন।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনের সময় নেজামে ইসলাম পার্টি যুক্তফ্রন্টের অন্যতম শরিক দল ছিল। নির্বাচনের পর ৩ এপ্রিল (১৯৫৪) শেরে বাংলা এ.কে ফজলুল হককে মুখ্যমন্ত্রী করে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। কিন্তু আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে কোনো মন্ত্রী শপথ গ্রহণ করে না। কারণ, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী শেখ মুজিবুর রহমানকেও মন্ত্রী হিসেবে তালিকাভুক্ত করায় ফজলুল হক অসন্তুষ্ট হন এবং বিরোধিতা করেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য এই জট খুলেছিল এবং আওয়ামী লীগের সদস্যরা শপথ নিয়েছিলেন।^{৫০} এই জট খুলেছিল কীভাবে? শেরে বাংলা তখন বর্ষিয়ান রাজনীতিবিদ, বাংলার অবিসংবাদিত নেতা আর শেখ মুজিব তখন তরুণ নেতা। তাঁর যেখানে অমত সেখানে শেখ মুজিবুরের মন্ত্রী হওয়া আসলেই কঠিন ছিল। এসময় আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি শেখ মুজিবুর রহমানকে মন্ত্রী করার জন্য হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। শেরে বাংলা এ.কে ফজলুল হক এই দুই নেতাকেও জানিয়ে দেন তাঁর অমতের কথা। শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মজীবনীতেও বিষয়টি বিবৃত হয়েছে। শেখ মুজিব লিখছেন, ‘হক সাহেব শহীদ সাহেব ও ভাসানীকে বলেছেন, “আমি শেখ মুজিবকে আমার মন্ত্রিত্বে নেব না।”’^{৫১} এই পরিস্থিতিতে দলীয়ভাবে আওয়ামী লীগ এবং দলের নেতা শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও মাওলানা ভাসানীর পাশাপাশি নেজামে ইসলাম পার্টি ও এ দলের সভাপতি মাওলানা আতহার আলি শেরে বাংলার ওপর চাপ প্রয়োগ করেন। আতহার আলি নাকি বলেছিলেন যে, তাঁর দল সেই সরকারে থাকবেন না যদি শেখ মুজিবুর রহমানকে মন্ত্রিত্ব দেওয়া না হয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে, শেখ মুজিবের প্রথম মন্ত্রী হওয়ার পেছনে ইসলামপন্থীদের ভূমিকা আছে।

^{৫০}. মাহমুদুর রহমান মান্না, *বাংলাদেশের ছাত্ররাজনীতি : অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ*, (ঢাকা : রুক্মিণী শাহ ক্রিয়েটিভ পাবলিশার্স, তৃতীয় সংস্করণ, ২০১৫), পৃষ্ঠা-৩৭

^{৫১}. শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, (ঢাকা : দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০১২), পৃষ্ঠা- ২৬০

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শৈশব, কৈশোর কেটেছে পারিবারিক পরিবেশে ধর্মীয় আবহে। তাঁর পিতা শেখ লুৎফুর রহমান ছিলেন আলেমভক্ত ও ধার্মিক ব্যক্তিত্ব। রাজনীতির উত্থানের সময়ে এবং যুবক বয়সে শেখ মুজিবুর রহমানের ওপর মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী ও মাওলানা আতহার আলীর বেশ প্রভাব ছিল। তাদেরকে অনেক সম্মান করতেন। শামছুল হক ফরিদপুরী ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমানের এলাকার। তাকে দাদা ডাকতেন। তাঁর সাথে গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল শেখ সাহেবের। তাঁর গায়ের বিখ্যাত মুজিব-কোটও এই ফরিদপুরী হুজুরের! একজন লিখেন, ‘আল্লামা শামছুল হক ফরিদপুরী সব সময় পানজাবির ওপরে কালো কোট পড়তেন। একদিন লালবাগে (লালবাগ মাদ্রাসায়) হুজুরের কামরায় শেখ মুজিবুর রহমান বসা। মুজিব বললেন, ‘দাদা, আপনার কোট আমার খুব ভালো লাগে।’ সাথে সাথে সদর সাহেব হুজুর নিজের পরনের কালো কোটটি গা থেকে খুলে মুজিবকে পরিয়ে দিলেন। বললেন, ‘গায়ে দাওতো দেখি, তোমাকে কেমন লাগে। মুজিব পরতেই ফরিদপুরী বললেন, ‘দারুণ তো লাগছে। ঠিক আছে, তোমাকে দিয়ে দিলাম।’ তুমি সব সময় এটা পরে মিটিং-মিছিলে যাবে।’ সেই যে দাদাহুজুরের কালো কোট শেখ মুজিবুর রহমান গায়ে পরেছিলেন, বরকতের জন্যই কি না কে জানে, আমৃত্যু এই কালো কোট ছিল তাঁর নিত্য সঙ্গি। বঙ্গবন্ধুর প্রিয় পোশাক।’^{৫২}

আইয়ুববিরোধী আন্দোলন, ছয় দফার আন্দোলন ও সত্তরের নির্বাচন : ১৯৭১ সালের যে মুক্তিযুদ্ধ ইস্যুতে কলঙ্ক তিলক বয়ে বেড়াচ্ছে জামায়াতে ইসলামীসহ বিভিন্ন ইসলামি রাজনৈতিক দল; সেই মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি তৈরিতে জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলাম পার্টির রয়েছে অবদান। যে ছয় দফার মাধ্যমে বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা হলেন শেখ মুজিবুর রহমান, সেই ছয় দফার আন্দোলনে ফুয়েল যুগিয়েছে এই জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলাম আর হারিয়ে যাওয়া খেলাফতে রব্বানী পার্টি। ছয় দফার পথ ধরে সত্তরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করে। আইয়ুব খানের পতন নিশ্চিত হয় আওয়ামী লীগ, ন্যাপ, জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলামসহ সম্মিলিত বিরোধী দলের আন্দোলনের মুখে। ১৯৭০ সালে ইয়াহিয়া খান যে সাধারণ নির্বাচন ঘোষণা করেন সে নির্বাচন অনুষ্ঠান ছিল তৎকালীন পাকিস্তানে আন্দোলনরত সকল বিরোধী দলের যুগপৎ ও সম্মিলিত আন্দোলনের ফসল। পুরো দশক জুড়ে সে আন্দোলন হয় সম্মিলিত বিরোধী দল বা ‘কপ’, ‘পিডিএম’ পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট এবং ডেমোক্যাটিক অ্যাকশন কমিটি (ডাক)-এর ব্যানারে।

কপ, ডাক ও পিডিএম-এর ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালে সংঘটিত হয় মুক্তিযুদ্ধ। আইয়ুব খানের আমলে বাম ধারার দলগুলো নিষিদ্ধ থাকার ফলে আইয়ুববিরোধী আন্দোলনের মূলে ছিল জামায়াত (পূর্ব এবং পশ্চিম দুই জায়গায়)। জামায়াত ওই সময় জনগণের ব্যাপক সমর্থন পায়। ওই

^{৫২}. সৈয়দ আনোয়ার আবদুল্লাহ, হুজুর কোটটি খুলে শেখ মুজিবের গায়ে পরিয়ে দিলেন, আওয়ার ইসলাম (OURISLAM24.COM), আগস্ট ১০, ২০১৬ (লিংক : <http://ourislam24.com/> হুজুর-কোটটি-খুলে-শেখ-মুজিব/)

আন্দোলনের ধারাবাহিকতাই পূর্ব পাকিস্তানকে একান্তরে পৌঁছিয়ে দেয়। পরিস্থিতির এই বুঝ জামায়াত নেতৃবৃন্দের কাছে ছিল। অধ্যাপক গোলাম আযম নিজেই লিখছেন—

‘নির্বাচনের পর ১৯৭১-এর জানুয়ারিতে লাহোরে মাওলানা মওদুদীর সভাপতিত্বে জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরায় সিদ্ধান্ত হয় যে, যদি নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পর্যায়ক্রমে বাংলাদেশ পাকিস্তান থেকে আলাদা হয়ে যেতে থাকে, তাহলে জামায়াত এর বিরোধিতা করবে না। এ বিষয়ে এখানকার প্রাদেশিক জামায়াতকে যেকোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য পূর্ণ এখতিয়ার দেওয়া হলো।’ এরপর এ সম্পর্কে যাবতীয় সিদ্ধান্ত পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক জামায়াতই নিতে থাকে।^{৫৩}

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু পর্যন্ত জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানী জাতির বিপক্ষে ছিল। জামায়াতে ইসলামীর পূর্ব পাকিস্তানের আমির অধ্যাপক গোলাম আযম শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের পক্ষে বক্তব্য দেন।^{৫৪} ১৯৭১ সালের ১ মার্চ গোলাম আযম পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতি বিনাশের চেষ্টার জন্য জুলফিকার আলি ভুট্টোকে দায়ী করে অধিবেশন স্থগিতের ঘোষণা অযৌক্তিক বলে প্রতিক্রিয়া জানান।^{৫৫} এমনকী পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর মজলিসে শূরা বৈঠক ডাকা হয় এই ইস্যুতে। মজলিসে শূরার অধিকাংশ সদস্য মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা না করার পক্ষে মত দেন।

মজলিসে শূরা যেখানে মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে চায়নি, জামায়াতের কেন্দ্রীয় আমির সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদীও এ বিষয়ে মতামত দেন, পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা এবং তৎকালীন জামায়াতের কেন্দ্রীয় নায়েবে আমির মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীমও মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা না করার পক্ষে মত দেন; তারপর কেন মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো? সেটা কি আওয়ামী লীগের সাথে জামায়াতের দূরত্বের কারণে? আওয়ামী লীগের সাথে জামায়াতের একটা মনস্তাত্ত্বিক দূরত্ব ছিল। ১৮ই জানুয়ারি ১৯৭০ পল্টনে জামায়াতের সমাবেশে আওয়ামী লীগের হামলা চালানোর পর হতে রাজনৈতিক দূরত্ব বাড়তে থাকে। ওই হামলায় ২জন জামায়াত কর্মী মারা যান।

১৯৬৬ সালে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের ছয় দফা আন্দোলনের সূচনা হলেও শেখ মুজিবসহ আওয়ামী লীগের অনেক নেতার গ্রেফতার, ১৯৬৮ সালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের এবং আওয়ামী লীগ কর্মীদের ওপর নির্যাতনের ফলে ছয় দফা কর্মসূচি সাময়িকভাবে স্থগিত হয়ে পড়ে।^{৫৬} এ বছরের ৭ই জুনের পর ৬ দফা নিয়ে আওয়ামী লীগের আন্দোলন ঝিমিয়ে

^{৫৩}. অধ্যাপক গোলাম আযম, *পলাশী থেকে বাংলাদেশ*, পৃষ্ঠা-১৩

^{৫৪}. আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন, *বাংলা ও বাঙালির ইতিহাস চতুর্থ খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা, ৪১৮

^{৫৫}. হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলীলপত্র ২য় খণ্ড*, (ঢাকা : তথ্য মন্ত্রণালয়, ১৯৮২), পৃষ্ঠা-৮১৮

^{৫৬}. বাংলাপিডিয়া বিশ্বকোষ, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত।

পড়লেও জামায়াত আইয়ুববিরোধী আন্দোলন নিরলস তৎপরতা দিয়ে প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত ছড়িয়ে দেয়। আন্দোলনকে সম্প্রসারিত করার জন্য জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে পিডিএম গঠিত হয়। ১৯৬৭ সালের ৩০ এপ্রিল ঢাকায় আতাউর রহমান খানের বাসায় সভা করে পিডিএম গঠন করা হয়।^{৫৭} পরবর্তী পর্যায়ে আন্দোলনের আরও ব্যাপ্তি আনার জন্য ডেমোক্রেটিক অ্যাকশ্যান কমিটি গঠন করা হয়। দুই অবস্থানে জামায়াতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। বিমিয়ে পড়ার পর আওয়ামী লীগ কিংবা শেখ মুজিবুর রহমান হয়তো আটকে যেতেন; কিংবা ছয় দফার সফলতা অনেক পিছিয়ে যেত যদি ন্যাপ, জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলাম পার্টিসহ বিরোধী দলগুলো মাঠ ধরে না রাখত। ইসলামপন্থী দলসহ বিরোধী দলগুলো মাঠ চাঙ্গা রাখায় স্তিমিত হয়ে পড়া ছয় দফার আন্দোলন নিয়ে আবার মাঠে আসেন শেখ মুজিবুর রহমান। সে সময় আইয়ুববিরোধী আন্দোলনে মাঠে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখে আওয়ামী ও জামায়াতে ইসলামী। আর এ কারণে ‘আইয়ুব খানের অপছন্দের তালিকায় শীর্ষে ছিল জামায়াতে ইসলামী ও আওয়ামী লীগ।’^{৫৮}

ছেষট্টিতে ছয়দফা পেশের পর যে আন্দোলন-সংগ্রামের পটভূমিতে আইয়ুবের পতনের মধ্য দিয়ে সত্তরের নির্বাচনে বিজয়ের সিঁড়ি বেয়ে ১৯৭১ সালের ন’মাস ব্যাপী রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের ফসল যে বাংলাদেশ; সেই মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি রচনায়, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ক্ষেত্র সৃষ্টিতে, আইয়ুবের পতনে, ছয়দফা আন্দোলনের উর্বর ময়দান তৈরিতে জামায়াতে ইসলামীর রয়েছে ফলাফলবিহীন অবদান। স্বাধীন বাংলাদেশে ঠাই হয়নি জামায়াতে ইসলামীর। কারণ, তারা অখণ্ডতার পক্ষে ছিল। কী হতো পাকিস্তান অখণ্ড থাকলে? জামায়াতে ইসলামী কিংবা নেজামে ইসলাম কি বসত ক্ষমতায়?

মাওলানা আবদুর রহীম দলীয় বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে দূরদর্শী চিন্তা করতেন। জামায়াত আইয়ুববিরোধী আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের পর এবং ১৯৬৬ সালে শেখ মুজিবুর রহমানের ছয় দফা পেশের পর ছয় দফা আন্দোলন গুরুত্ব ফলে তিনি পাকিস্তানে রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ এবং সেইসঙ্গে এসব আন্দোলন থেকে জামায়াতে ইসলামীর ফলাফল নিয়ে চিন্তা করতে লাগলেন। তিনি স্পষ্টই বুঝতে পারছিলেন, ছয় দফার আন্দোলন, পিডিএম, ডাক ইত্যাদির আন্দোলনে জামায়াতের খুব একটা ফায়দা হবে না। এসব আন্দোলনের ফসল অন্যরা ঘরে তুলবে এবং দল হিসেবে জামায়াত ক্ষতিগ্রস্ত হবে। মাওলানা আবদুর রহীম তখন দলেও আমির হলেও জামায়াতের ইসলামীর নেতৃত্বে ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে অধ্যাপক গোলাম আযমের প্রাধান্য ছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬৮ সালের মাঝামাঝি সময়ে মাওলানা আবদুর রহীম পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামী আমিরের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিয়ে নিখিল পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামী ‘নায়েবে আমির’ নিযুক্ত হন।^{৫৯} আইয়ুব খান তার অবৈধ ক্ষমতাকে বৈধতা

^{৫৭}. মহিউদ্দিন আহমদ, আওয়ামী লীগ : উত্থান পর্ব ১৯৪৮-১৯৭০, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৪৫

^{৫৮}. মহিউদ্দিন আহমদ, আওয়ামী লীগ : উত্থান পর্ব ১৯৪৮-১৯৭০, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৬৪

^{৫৯}. এসএম সাখাওয়াত হুসাইন, ইসলামি রাজনীতিতে মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, দৈনিক ইনকিলাব, অক্টোবর ১, ২০১৬

দেওয়ার লক্ষ্যে ১৯৬৪ সালে এক প্রহসনমূলক নির্বাচনের আয়োজন করলেন। এসময় ‘সম্মিলিত বিরোধী দলসমূহ’ কায়েদে আজমের বোন ফাতেমা জিন্নাহকে আইয়ুবের বিরুদ্ধে একমাত্র প্রার্থী রূপে মনোনয়ন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। মাওলানা আবদুর রহীম এর ক্ষতিকর দিক তুলে ভিন্নমত পোষণ করেন। কিন্তু জামায়াতের সাংগঠনিক কাঠামো ছিল এমনই যে, তাঁর এই ভিন্নমত দলে সিদ্ধান্ত পালটাতে কোনো ভূমিকাই রাখতে পারল না।^{৬০}

জামায়াত যেটুকু এগিয়েছিল সামরিক শাসনবিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে, ১৯৬১ থেকে ১৯৭০, নয় বছরে; একাত্তর পিছিয়ে দেয় আরও নয় বছর। ১৯৭৯ সালের ২৭ মে বাংলাদেশে জামায়াতে ইসলামী আবার আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু করে। এরশাদবিরোধী আন্দোলনে রাজপথে ক্লাস্তিহীন জামায়াতের উপস্থিতির কারণে এরশাদের পতন ত্বরান্বিত হয়। জামায়াতে সমর্থন নিয়ে ১৯৯১ সালে খালেদা জিয়া এলেন ক্ষমতায়। জামায়াত জনগণের কাছাকাছি চলে যায়। পঞ্চম সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে দেশের প্রায় ১৫% জনগণের দলে পরিণত হয় দলটি। কিছু দিন যেতে না যেতে বিএনপির সাথে তৈরি হয় বৈরিতা, জামায়াতের সাথে আওয়ামী লীগ গড়ে তুলে সখ্যতা। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আন্দোলনে বিএনপির পতন হয়; জামায়াতেরও শোচনীয় পরাজয় ঘটে। ছিয়ানব্বইর নির্বাচনে জামায়াত নেমে আসে ১৮ থেকে ৩-এ। ৮ ভাগ জনগণ তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। ক্ষমতায় এলেন শেখ হাসিনা। এরশাদের পতনে খালেদার আগমনে অবদান রেখে জামায়াতে ইসলামী রাজপথে ফলবিহীন অবদান রাখে ১৯৯১-এর পরে এসে। সেই ঐতিহাসিক ভুল- আওয়ামী লীগের সাথে সখ্যতা ও যুগপৎ আন্দোলন। জামায়াতে ইসলামী যেটুকু এগিয়েছিল এরশাদবিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে, ১৯৮২ থেকে ১৯৯১, নয় বছরে; আওয়ামী লীগের সাথে যুগপৎ আন্দোলন আবারও পিছিয়ে দেয়। ছিয়ানব্বইর শেখ হাসিনা শক্তির অভাব ও চক্ষু লজ্জার কারণে জামায়াত নেতাদেরকে ফাঁসিতে ঝোলাননি। জামায়াত রাজপথে সোচ্চার না থাকলে এবং বিএনপির বিরুদ্ধে অবস্থান না নিলে ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসতে পারত না। কারণ, আওয়ামী লীগ-বিএনপির মিলিত আন্দোলনে কোণঠাসা হওয়ার পরও সপ্তম সংসদ নির্বাচনে বিএনপি আওয়ামী লীগের প্রায় পাশাপাশি ভোট পায়। আওয়ামী লীগ ৩৩% ভোট পেয়ে ক্ষমতাসীন হয়, আর বিএনপি ৩০% ভোট পেয়ে বিরোধী দল হয়। সেদিন আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন না হলে দলটি পরবর্তী সময়ে হয়তো আর সহজে ক্ষমতায় আসতে পারত না। আর যদিও আসত, তবুও এত শক্তিশালী থাকত না। জামায়াতের নেতাদের ওপর এত খড়গ কৃপাণ হওয়ার মতো শক্তি থাকত না।

বাংলাদেশের ইসলামপন্থীরা রাজনীতিতে সচরাচর ভুল করে না, মুহূর্তে মুহূর্তেও ভুল করে না; ভুল করে ঐতিহাসিক মুহূর্তে। রাজনৈতিক কার্যক্রম, গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ, নেতা-কর্মীর নিয়মিত সাংগঠনিক তৎপরতা এসব ইসলামি দলকে প্রতিদিন এগিয়ে নিয়ে যায়;

^{৬০}. এসএম সাখাওয়াত হুসাইন, প্রাণ্ডক্ত

আর গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তের ভুল সিদ্ধান্ত আবার অনেক পিছিয়ে দেয়। অনেক কষ্টে গড়া অর্জন, তিলে তিলে জমা রাজনৈতিক সঞ্চয়, হঠাৎ খেয়ে ফেলে রাজনৈতিক একটি পটপরিবর্তন। সাংগঠনিক কর্মতৎপরতা গণতান্ত্রিক আন্দোলন সংগ্রামে ভূমিকা রেখে পাঁচ বছরে যা অর্জন হয়, একটা সিদ্ধান্ত পিছিয়ে দেয় আরও পাঁচ বা দশ বছর।

জামায়াত বর্তমানে দেশের প্রায় ৮ ভাগ ভোটের প্রতিনিধিত্ব করছে। এই অর্জন আরও ৫৫ বছর আগের। জামায়াতে ইসলামী প্রতিষ্ঠার ২১ বছরের মাথায় এবং বাংলাদেশে এ দলটির আগমনের ১২/১৩ বছরের মধ্যে ১৯৬২ সালে এ ভূখণ্ডে ভোটের রাজনীতিতে যে পরিমাণ প্রতিনিধিত্ব ছিল, ২০১৮ সালেও সেই প্রায় একই পরিমাণ ভোটের প্রতিনিধিত্ব করছে দলটি।

১৯৬২ সালে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামী ৬-৭% ভোট পায়। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানে জামায়াতে ইসলামীর মোট প্রাপ্ত ভোটের পরিমাণ ছিল এই ৬-৭%। জি, ডব্লিউ, চৌধুরী^{৬১} তাঁর বইয়ে ভোটের হিসেব ও তখনকার নির্বাচনের ফলাফল বিষয়ে বিস্তারিত তুলে ধরেছেন। ২০০৮ সালের নির্বাচনে এ দলের প্রাপ্ত ভোটের হার ৮%। ১৯৭০ সালের নির্বাচন অনুযায়ী অফিসিয়ালী জামায়াতে ইসলামী ৬% ভোটের প্রতিনিধিত্ব করলেও প্রকৃতপক্ষে সে সময় পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামী ১০% জনগণের প্রতিনিধিত্ব করছিল। ১৯৭০ সালের জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের ১৬২টি সাধারণ আসনে জামায়াতে ইসলামী ৭০টি আসনে প্রার্থী দেয়।^{৬২} বাকি ৯২ আসনের বেশির ভাগ আসনে প্রার্থী দিতে পারেনি তাদের প্রার্থী দেওয়ার মতো লোক না থাকায়। তখন জামায়াতের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী বিধান ছিল দলের সদস্য (রুকন) ছাড়া প্রার্থিতা দেওয়া যাবে না। বাকি ৯২টি আসনে জামায়াতের কম-বেশি ভোট ছিল। কিন্তু শতকরা হিসেব তো হয়েছে ৭০ আসন ধরে। এই ৭০ আসনের হিসেব দিয়ে জামায়াতের মোট প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হার ৬%।^{৬৩} বাকি ৯২টি আসনের জনসমর্থন কাউন্ট করলে বলা যায়, ১৯৭০ সালে এ দেশের তথা পূর্ব পাকিস্তানে ভোটের প্রতিনিধিত্ব ছিল ১০%। তখন জামায়াতে ইসলামীর নেতা, সদস্য (রুকন), কর্মী অনেক কম ছিল। এখন দলের সদস্যের পরিমাণ তখনকার চাইতে কয়েকগুণ। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের চাইতে জামায়াতের নেতা-কর্মী সদস্য বৃদ্ধির হার বেশি, কিন্তু ভোটের হার অপরিবর্তিত।

^{৬১}. জি, ডব্লিউ, চৌধুরীর পুরো নাম গোলাম ওয়াহিদ চৌধুরী। পৈতৃক বাড়ি মাদারীপুর। ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। এরপর পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালক হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৬৯-৭২, অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি ইয়ারহিয়া খানের কেবিনেটে যোগাযোগমন্ত্রী ছিলেন। বাংলাদেশের রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অধ্যাপিকা দিলারা চৌধুরীর স্বামী তিনি। দেশ স্বাধীনের পর তিনি বাংলাদেশের নাগরিকত্ব পাননি। পাকিস্তানে গিয়ে স্থায়ী না হয়ে শেষ পর্যন্ত তিনি আমেরিকায় থিতু হন। তাঁর লেখা অখণ্ড পাকিস্তানের শেষ দিনগুলি বইটিতে মুক্তিযুদ্ধ এবং এর আগের দিনগুলোর একটা নিরপেক্ষ বিবরণ ফুটে উঠেছে। তবে তিনি যে অখণ্ড পাকিস্তানের পক্ষে- সেটাও ফুটিয়ে তুলেছেন।

^{৬২}. জি, ডব্লিউ, চৌধুরী, অখণ্ড পাকিস্তানের শেষ দিনগুলি, সিদ্দীক সালাম অনূদিত, (ঢাকা : হককথা প্রকাশনী, ১৯৯১), পৃষ্ঠা-১১১

^{৬৩}. জি, ডব্লিউ, চৌধুরী, প্রাপ্তজ, পৃষ্ঠা-১২৫

১৯৭০ সালে জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে ১৬২টি সাধারণ আসনে পূর্ব পাকিস্তান থেকে অংশগ্রহণকারী দল, প্রার্থী সংখ্যা ও প্রাপ্ত ভোটের হার

১.	দলের নাম	প্রার্থীর সংখ্যা	ভোটের হার
২.	আওয়ামী লীগ	১৬২ (জয়ী ১৬০)	৭৪.৯
৩.	জামায়াতে ইসলামী	৭০	৬
৪.	পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি (পিডিপি)	৭৯ (জয়ী ০১)	২.৯
৫.	মুসলিম লীগ (কনভেনশন)	৯৩	২.৮
৬.	মুসলিম লীগ (কাউন্সিল)	৫০	১.৬
৭.	মুসলিম লীগ (কাইয়ুম)	৬৫	১
৮.	ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি-ন্যাপ (ভাসানী গ্রুপ)	১৪	-
৯.	ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি-ন্যাপ (ওয়ালী খান গ্রুপ)	৩৯	১.৮
১০.	কেন্দ্রীয় জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ও নেজামে ইসলাম	৪৯	০.৯
১১.	জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম, প. পাকিস্তান	১৫	-
১২.	ইসলামী গণতন্ত্রী দল	৫	-
১৩.	জাতীয় গণমুক্তি দল	৫	-
১৪.	কৃষক শ্রমিক পার্টি	৪	-
১৫.	পাকিস্তান ন্যাশনাল কংগ্রেস	৪	-
১৬.	পাকিস্তান জাতীয় লীগ	১২	-
১৭.	পাকিস্তান দরদি সংঘ	১	-
১৮.	স্বতন্ত্র	১১৪ (জয়ী ০১) ^{৬৪}	৩.৪
মোট		৭৮১	-

বাকিগুলোর প্রাপ্ত ভোটের হার হিসেবে আনা হয়নি। কারণ, প্রাপ্ত ভোটের শতকরা সে হার খুবই কম ছিল।

১৯৭০ সালের নির্বাচনের ফলাফল অনুযায়ী পূর্ব পাকিস্তানে জামায়াতে ইসলামী দ্বিতীয় বৃহৎ রাজনৈতিক দল। যদিও আওয়ামী লীগের বিজয়ী প্রার্থীদের সাথে জামায়াতের প্রার্থীর ভোটের ব্যবধান অনেক বেশি ছিল, কিন্তু এই ৭০ আসনের বেশির ভাগ আসনে জামায়াতের প্রার্থীরা ২য় অবস্থানে ছিল। এতে বোঝা যায়, সে সময় আওয়ামী লীগের বিকল্প হিসেবে মানুষ জামায়াতকে পছন্দ করার মতো একটা অবস্থায় ছিল। কারণ, এর আগের বিপুল জনপ্রিয় দল মুসলিম লীগ

^{৬৪.} স্বতন্ত্র প্রার্থীদের মধ্যে একমাত্র জয়ী প্রার্থী পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে রাজা ত্রিদিব রায়। নির্বাচনের আগে ত্রিদিব রায়কে শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী লীগে যোগদানের আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং আওয়ামী লীগের টিকিটে নির্বাচন করার কথা বলেন। কিন্তু ত্রিদিব রায় স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করেন।

তখন পূর্ব পাকিস্তানে ছোটো দলে পরিণত হয়েছে। সত্তরের নির্বাচনে মুসলিম লীগের তিনটি গ্রুপের মিলিত ভোটের পরিমাণ ছিল ৭%। জামায়াতের একাই ভোট ছিল ৬%। মুসলিম লীগের তিন গ্রুপ মিলিয়ে ২০৮ জন প্রার্থীর বিপরীতে এই ভোট, আর জামায়াতের ৭০ আসনের বিপরীতে এই ভোট। এতে বোঝা যায়, সত্তরের নির্বাচনে বিপুল জনপ্রিয় আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে মানুষ চলে গেলে আস্তে আস্তে মানুষ জামায়াতে ইসলামীকেই পছন্দ করত। কিন্তু ১৯৭১ সালের কারণে সে সম্ভাবনা উবে যায়। ১৯৭৪-৭৫ সালের দিকে মানুষ যখন আওয়ামী লীগ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তখন রাতারাতি গড়ে উঠা দল বিএনপির প্রতি ঝুঁকে মানুষ। কিন্তু সত্তরের নির্বাচনে মানুষের সেকেন্ড চয়েজ ছিল জামায়াতে ইসলামী। আওয়ামী লীগের বিকল্প হিসেবে মানুষ ডানপন্থী দলই গ্রহণ করতে চেয়েছিল। ১৯৭২-৭৫ সালে জাসদ আবির্ভূত হলেও, দেশের জনগণের চাহিদা অনুযায়ী তারা ডানপন্থী না হওয়ায় মানুষ জাসদের প্রতি ঝুঁকেছে। পরে বিএনপির প্রতি ঝুঁকেছে।

জামায়াতের সাথে সখ্যতা ও আওয়ামী লীগের পুনর্জীবন : জামায়াতের অবস্থান অখণ্ড পাকিস্তানের পক্ষে থাকলেও বাংলাদেশে রাজনীতি শুরুর পর জামায়াত ভালো একটা অবস্থান তৈরি করে নেয়। পুরোপুরি গণভিত্তি তৈরি করতে না পারলেও রাজনীতিতে একটি শক্তি হিসেবে নিজদেরকে প্রমাণ করে। আওয়ামী লীগ জামায়াতের সে জনপ্রিয়তা এবং শক্তির বিষয়টি আঁচ করতে পেরেছিল। তাই তারা কঠিনভাবে হিসেব কষে। জামায়াতের সাথে গড়ে তুলে সখ্যতা। একদিকে সখ্যতা গড়ে, অন্যদিকে ঘাতক-দালাল-নির্মূল কমিটি (ঘাদানিক) লেগে যায় জামায়াতের পেছনে। ‘যুদ্ধাপরাধীদের ফাঁসি চাই’ দাবিতে কেটেছে তাদের বহু বিন্দি রজনী। অন্যদিকে, আওয়ামী লীগের সাথে বিএনপি সরকারবিরোধী যুগপৎ আন্দোলন করে বহু বিন্দি রজনী কেটেছে জামায়াতের। জামায়াতকে নিয়ে আন্দোলন করে রাজনীতির হারানো অবস্থান ফিরিয়ে আনল আওয়ামী লীগ। সে হারানো অবস্থান ফিরে পেয়ে ঘাদানিকের দাবি বাস্তবায়ন করল তারা। আওয়ামী লীগ সরকার সেসব জামায়াত নেতাকে ফাঁসি দেয়, যাদের সাথে তারা সেদিন যুগপৎ কর্মসূচিতে রাজপথে ছিল বিএনপিকে কঠিন শিক্ষা দিতে। বিএনপিকে ক্ষমতা থেকে হঠানো নিশ্চিত করতে সেদিন আওয়ামী লীগ ও জামায়াতের এমপিরা সংসদ থেকে পদত্যাগ করেন।^{৬৫} বেসামাল হয়ে পড়ে বিএনপি সরকার।

^{৬৫}. সংসদ ভেঙে দিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধিনে নির্বাচনের দাবিতে ১৯৯৪ সালে ২৮ ডিসেম্বর পঞ্চম সংসদের পাঁচ দলের ১৪৭ জন বিরোধীদলীয় এমপি একযোগে পদত্যাগ করেন। আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি, এনডিপি সহ চার দলের ১২৭ আর জামায়াতের ২০ এমপি স্পিকারের কাছে পদত্যাগপত্র জমা দিলে তিনি তা গ্রহণ করতে চাননি। এমপিরা হাইকোর্টে রিট করেন। হাইকোর্টের সিদ্ধান্ত তাদের অনুকূলে গেলে স্পিকার পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেন। জামায়াতের বাইরের এই ১২৭ জন এমপির মধ্যে ৯০ জন এমপি ২০০৮ সালের নবম সংসদ নির্বাচনে জয়ী হয়ে ৩০ জুন ২০১১ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাতিলের পক্ষে ভোট দেন। একমাত্র বিমানমন্ত্রী নৈতিকতার কারণেই ভোটদানে বিরত থাকতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি ২০০৮ সালের নির্বাচনে নৌকা প্রতীকে অংশগ্রহণ করায় পক্ষে ভোট না দিলে ৭০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংসদ সদস্য পদ খারিজ হয়ে যাবে বিধায় তিনিও পক্ষে ভোট দেন।

১৫ ফেব্রুয়ারির মন্ত্রসহ কোনো মন্ত্র-ই কাজ দেয়নি; ১৯৯৬ সালে ক্ষমতা থেকে হঠাৎ বাধ্য হয়। অন্যদিকে, ঘাতক-দালাল-নির্মূল কমিটির আন্দোলন এবং আওয়ামী লীগের সাথে সখ্যতা গড়ে তোলায় জামায়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় অনেক ভোটার। এ সখ্যতা ভালো চোখে দেখেনি অনেকে। ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে জামায়াতের আসন নেমে আসে ৩ টিতে। ৩০০ আসনে প্রার্থী দিয়েও ভোট পায় ৮.৬১%। অথচ এর আগের ১৯৯১ সালের নির্বাচনে ২২২ আসনে প্রার্থী দিয়ে ভোট পেয়েছিল ১২%-এর বেশি। আওয়ামী লীগ ঠিকই ফসল ঘরে তুলেছিল। জামায়াতকে সাথে নিয়ে আন্দোলন করে ২১ বছর পরে ক্ষমতায় আসে। নিম্নমুখি হয় জামায়াতের সমর্থনসূচক।

দেশের বিগত কয়েক দশকের অবস্থা বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ঐতিহাসিক এবং গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন সময়ে অন্যান্য ইসলামি রাজনৈতিক দলগুলোও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে রাজনৈতিকভাবে ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এসব ভুলের কারণে রাজনৈতিক হিসাব-নিকাশে তারা পিছিয়েছে অনেক। অন্যান্য রাজনৈতিক দলের মতো ইসলামি রাজনৈতিক দলগুলো জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে অনেক সময় অংশগ্রহণ করে না কিংবা নিজস্ব অবস্থান ব্যক্ত করে না। কখনো যদি কোনো বিষয়ে অংশগ্রহণ করে নিজস্ব অবস্থান ব্যক্ত করে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা গেছে ইসলামি সংগঠনগুলো ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

পৃথিবীর কোনো কিছুই ভুল-ত্রুটির উর্ধ্বে নয়। ভুল থাকাই স্বাভাবিক। আর এটাও স্বাভাবিক যে, কোনো কর্ম বা গৃহীত পথ ও পন্থা মানুষ পরীক্ষা-নিরীক্ষার করে ভুল প্রমাণিত হলে সে পথ ত্যাগ করে সঠিক পথে ফিরে আসা। কিন্তু এটা চরম অস্বাভাবিক যে, কোনে পূর্ব গৃহীত সিদ্ধান্ত ভুল হলেও আঁকড়ে থাকতে হবে— এই মানসিকতা পোষণ করা। ইসলামি দলগুলোর ক্ষেত্রে এ বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়।

যেকোনো সংগঠন কিংবা গ্রুপের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়টির গুরুত্ব অপরিসীম। রাজনৈতিক দলের ক্ষেত্রে একেকটা গুরুত্বপূর্ণ সময় অনেক সময় একেকটা ঐতিহাসিক সময় হয়ে যায়। এই ঐতিহাসিক সময়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে দলের সর্বোচ্চ ফোরামের সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

আদর্শিক গণভিত্তির অভাব

বাংলাদেশের ইসলামি রাজনৈতিক দলগুলো একটি আদর্শ কল্যাণকামী রাষ্ট্র বা ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এ ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা প্রচলিত গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্য দিয়ে অসম্ভব। ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য দুটো জিনিস প্রয়োজন (১) একঝাঁক যোগ্য ইসলামি আদর্শিক নেতৃত্ব আর (২) ইসলামি গণভিত্তি। কিছু ইসলামি দল আদর্শিক নেতৃত্ব বা ব্যক্তিত্ব তৈরির কাজ করেছে। দীর্ঘদিন রাজনীতি ও আদর্শের ময়দানে কাজ করার পরও কোনো ইসলামি দলই দেশ পরিচালনার পুরো উপযোগী একঝাঁক আদর্শিক ব্যক্তিত্ব পুরোপুরি সৃষ্টি করতে পারেনি।

ইসলামি গণভিত্তি তৈরির কাজে কোনো ইসলামি দলই কাজিষ্কৃত সফলতা দেখাতে পারেনি। এ ক্ষেত্রে তাদের কর্মসূচিও লক্ষণীয় নয়। অথচ ইসলামি রাজনৈতিক দলগুলো দেশে ইসলামি বিপ্লবের কথা বলে। ইসলামি সমাজ বিপ্লব সাধনের জন্য একঝাঁক যোগ্য আদর্শিক ব্যক্তিত্বের পাশাপাশি প্রয়োজন ইসলামি গণভিত্তি। কোনো ভূখণ্ডের জনগোষ্ঠীর বিরাট অংশের ইসলামি চিন্তা-চেতনা, ইসলামি মন-মানসিকতা ও ইসলামি চরিত্রসম্পন্ন রূপে গড়ে উঠার নাম ইসলামি গণভিত্তি। এই গণভিত্তি গড়ে না উঠা পর্যন্ত কোনো ভূখণ্ডে ইসলামি বিপ্লব সংঘটিত হওয়া স্বাভাবিক নয়।^{৬৬}

রাসূলুল্লাহ (সা.) শুধু একঝাঁক যোগ্য ও আদর্শিক ব্যক্তিত্ব দিয়ে আদর্শিক রাষ্ট্র কায়েম করেননি; তিনি ইসলামি ব্যক্তি গঠন ও ইসলামি গণভিত্তি সৃষ্টির জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। এ কাজটি করার পরই মদিনায় আদর্শিক রাষ্ট্র কায়েম করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজে এবং তাঁর সাহাবিরা সমাজের সাধারণ মানুষের কাছে যেমন ইসলামের মর্মকথা পৌঁছানোর চেষ্টা করেছেন, তেমনিভাবে চেষ্টা করেছেন সমাজের চালিকাশক্তি অর্থাৎ নেতৃত্ব দানকারী ব্যক্তিদের কাছে তা পৌঁছানোর জন্য। তেরো বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আহ্বানে সাড়া দিয়ে মক্কার এক দল লোক ইসলাম গ্রহণ করেন।

তারা ইসলামের দীক্ষায় দীক্ষিত হয়ে ইসলামি আদর্শিক ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদেরকে সংঘবদ্ধ করে এবং প্রশিক্ষণ দিয়ে সুযোগ্য ইসলামি ব্যক্তিত্ব-রূপে গড়ে তোলেন। কিন্তু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের অধিকাংশ ইসলামবিরোধী হওয়ায় মক্কাবাসীরা গণহারে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আহ্বানে সাড়া দিতে পারেনি। ফলে মক্কায় গড়ে উঠেনি ইসলামি গণভিত্তি।

রাসূলুল্লাহ (সা.) ইসলামি গণভিত্তি না থাকায় মক্কায় ইসলামি রাষ্ট্র কায়েম থেকে বিরত থাকেন। অন্যদিকে ইয়াসরিবের^{৬৭} নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্বের অধিকাংশ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাঁর প্রতি সর্বাঙ্গিক সহযোগিতার হাত বাড়ান। নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির ইসলাম গ্রহণ করায় সাধারণ মানুষের ইসলাম গ্রহণ করা সহজ হয়ে যায়। ফলে দারুণ উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে এগিয়ে আসে ইয়াসরিবের বিপুল সংখ্যক মানুষ। গড়ে উঠে ইসলামি ভাবধারাপুষ্ট গণভিত্তি, ইসলামি সমাজ-সভ্যতা-সংস্কৃতি বিনির্মাণের বুনয়াদ।^{৬৮} এই ইসলামি গণভিত্তি তৈরি হওয়ার পরই কেবল রাসূলুল্লাহ (সা.) ইসলামি রাষ্ট্র তথা আদর্শিক রাষ্ট্র গড়ে তোলার প্রয়াস পান।

বাংলাদেশ যদিও ৯০ ভাগেরও বেশি মুসলিমের দেশ, এ দেশে সাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্রধর্ম যদিও ইসলাম; কিন্তু এ দেশে ইসলামি দলগুলোর আদর্শিক রাষ্ট্র কায়েমের উপযোগী ইসলামি গণভিত্তি এখনো তৈরি হয়নি। দেশের বেশির ভাগ মানুষের মধ্যে ইসলামের মৌলিক জ্ঞানের ঘাটতি রয়েছে। যে দেশে দীর্ঘদিন থেকে কাজ করে ইসলামি দলগুলো সাধারণ মুসলিমের শুদ্ধ কুরআন

৬৬. এ.কে.এম. নাজির আহমদ, ইসলামি বিপ্লবের স্বাভাবিক পদ্ধতি

৬৭. মদিনার পূর্ব নাম ছিল ইয়াসরিব

৬৮. এ.কে.এম. নাজির আহমদ, প্রাগুক্ত

পড়া শেখাতে পারেনি, সেখানে ইসলামি রাষ্ট্র কায়েম করা কেমনে সম্ভব। এ সমাজের বহু সংখ্যক মানুষ দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত, অনৈতিক-অন্যায় কাজে সম্পৃক্ততা আছে এমন সংখ্যক লোকও কি কম? বহু মানুষ চুরি-ডাকাতি-বদমাইসির সঙ্গে জড়িত। এসব কিছু ইসলামি চরিত্রের প্রতিকূল। কোনো ভূখণ্ডের জনগোষ্ঠীর বিরাট অংশের ইসলামি চিন্তা-চেতনা, ইসলামি মন-মানসিকতা ও ইসলামি চরিত্রসম্পন্নরূপে গড়ে উঠার নাম যদি হয় ইসলামি গণভিত্তি, তাহলে এ দেশের বেশির ভাগ মানুষ মুসলিম হলেও এই মুসলিমের বেশির ভাগ চিন্তা-চেতনা ও মানসিকতায় ইসলামি চরিত্রবানরূপে এখনো গড়ে উঠেনি। আবার যারা নামাজ পড়ে, রোজা রাখে, ইসলামি মানসিকতাসম্পন্ন ইসলামি চরিত্রবান; তাদের এক বিরাট অংশ সূরা-কেরাত ঠিকমতো জানে না, যে সূরা-কেরাত নামাজের জন্য অপরিহার্য। কয়জন নামাজি ব্যক্তি সহিহভাবে সূরা ফাতিহা পড়তে পারে? বাংলাদেশের বিরাট সংখ্যক মুসলিমের অবস্থা একটি উদাহরণ থেকে সহজে অনুমেয়। গ্রামের এক লোক মসজিদের হুজুরকে নিজ গৃহে খাবারের দাওয়াত দিয়েছে। টেবিলে খাবার রেডি হওয়ার আগে দাওয়াতকারী লোক আর ইমাম সাহেবের মধ্যে কথাবার্তা চলছে। কথাবার্তার এক পর্যায়ে হুজুর লোককে জিজ্ঞেস করলেন, ‘আচ্ছা বলেন তো সাহেব- ফজরের নামাজ কয় রাকাত?’ লোক জবাব দিলো, ‘১৯ রাকাত’। অন্দরমহল থেকে লোকের স্ত্রী তার স্বামীর এ জবাবে লজ্জা পাচ্ছে। পর্দানশীন স্ত্রী ভালোভাবে জানে, ফজরের নামাজ কয় রাকাত। অপর কক্ষ থেকে হাতের চার আঙুলি দেখিয়ে সে তার স্বামীকে বলতে চাইল যে ফজরের নামাজ চার রাকাত। স্বামী উচ্চঃস্বরে তার স্ত্রীকে বলল, ‘তুমি চার রাকাত বলতে বলতেছ। আমি ইমাম সাহেবকে ১৯ রাকাত দিয়েও সন্তুষ্ট করতে পারছি না, আর তোমার চার রাকাত দিয়ে কীভাবে সন্তুষ্ট করব?’ এই হচ্ছে বাংলাদেশে বড়ো সংখ্যক এক জনগোষ্ঠীর চিত্র। এমন জনগোষ্ঠী যেখানে-সেখানে ইসলামি গণভিত্তি কীভাবে হবে।

বিভিন্ন ইসলামি দল হয়তো ইসলামি গণভিত্তি তৈরির জন্য কিছু কিছু কাজ করছে। সেটা যথেষ্ট নয়। কিছু কিছু দল বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছে। এসব প্রতিষ্ঠান গণভিত্তি তৈরির জন্য খুব একটা কাজে লাগছে না; বরং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে মানুষ এসব ইসলামি দলের বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য করছে। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে ইসলামি গণভিত্তি তৈরি সম্ভব নয়। ইসলামি গণভিত্তি হতে পারে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে, মানুষের মাঝে শিক্ষামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করে এবং আরও বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে। আর পরোক্ষভাবে হতে পারে ইসলামি দলগুলোর লোকজন বিভিন্নভাবে জনগণের কাছে ইসলামের মৌলিক শিক্ষা তুলে ধরার মাধ্যমে। একাজটি মসজিদের ইমাম, শিক্ষক ও অন্যান্য পেশার লোকজন করতে পারে। বাংলাদেশের বেশির ভাগ মসজিদের ইমাম কওমি মাদ্রাসার। তারা গণভিত্তি তৈরিতে ইসলামের মৌলিক জ্ঞান বিতরণের কাজ করলেও কওমি মাদ্রাসাভিত্তিক যে ইসলামি রাজনৈতিক দল তারা তো আদর্শ রাষ্ট্র কায়েম করার ধারে কাছেও নেই। অন্যদিকে জামায়াতে ইসলামী এ ক্ষেত্রে শীর্ষ ইসলামি দল হলেও বেশির ভাগ মসজিদের ইমাম তাদের বিরোধিতা করেন।

অরাজনৈতিক ধর্মীয় গণশিক্ষা পদ্ধতি : রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত চরম ধর্মবিরোধী নীতির প্রেক্ষিতে বদিউজ্জমান নুরসি পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ইসলাম সম্পর্কে আপাতদৃষ্টিতে রাজনীতি-নিরপেক্ষ ধর্মীয় শিক্ষা পদ্ধতির অনুসরণ করেন। ফলে তুরস্কের সমাজ ইসলামি মূল্যবোধে উজ্জীবিত হয়ে উঠে এবং ইসলামের প্রভাব ক্রমান্বয়ে শক্তিশালী হতে থাকে। এক পর্যায়ে রাষ্ট্র-আরোপিত ধর্মহীনতাবাদ ক্রমান্বয়ে সহনশীল ধর্মনিরপেক্ষতাবাদে রূপ লাভ করে। ইসলাম চর্চার ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও সাইদ নুরসির মতো তাত্ত্বিক-কর্মবীর ইসলামের সর্বজনীন ব্যাখ্যাকে পরিবর্তিত পরিস্থিতির আলোকে তুলে ধরতে সমর্থ হন। এ কারণে, দীর্ঘ সময় ধরে রাষ্ট্রীয়ভাবে ধর্মহীনতার চর্চা হলেও তুরস্কের সমাজ থেকে ইসলাম হারিয়ে যায়নি। বর্তমান তুরস্কের রাজনীতিতেও এর ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া লক্ষণীয়।

ভগ্নুর গণতন্ত্র ও প্রচলিত নির্বাচন ব্যবস্থা

বদরুল ইসলাম নামে একজন ভদ্রলোক একটি ইসলামি দলের সাথে সম্পৃক্ত। প্রবাসী। খুবই ধার্মিক লোক। মসজিদের মুতাওয়াল্লি করার চিন্তা-ভাবনা আছে গ্রামবাসীর। কিন্তু প্রবাসী হওয়ায় উক্ত পদে ওনাকে দেওয়া যায়নি। এই ভদ্র ধার্মিক লোকটি একেবারেই দেশে আসলেন। ওনার বাড়ির পাশের যে মসজিদ, যেটা ওই গ্রামের একমাত্র মসজিদ, ওই মসজিদের মুতাওয়াল্লি করার জন্য ভেতরে ভেতরে গ্রামের কিছু মুসল্লি চিন্তা-ভাবনাও করছেন। এমন সময় ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন চলে এলো। ভদ্রলোক বদরুল ইসলাম ইউপি নির্বাচনে মেম্বার পদে দাঁড়ালেন। ইউপি মেম্বার পদে আর যারা দাঁড়িয়েছিলেন চারিত্রিক দিক থেকে তো উনি খুবই ভালো ছিলেন, এর বাইরেও ব্যক্তি হিসেবে উনি সবচাইতে যোগ্যও ছিলেন। দেখা গেল নির্বাচনে দাঁড়ানোর পর তাঁর এক প্রতিবেশী মন্তব্য করলেন, ‘বদরুল ইসলাম খুবই ভালো একটা মানুষ। বর্তমান মুতাওয়াল্লি অনেকটা অসুস্থ। আমরা চিন্তা করছি বদরুল ইসলামকে মসজিদের মুতাওয়াল্লি পদে নিয়ে আসব। তাঁর আবার নির্বাচনে দাঁড়ানোর কী প্রয়োজন ছিল।’ দেখা গেল বদরুল ইসলাম নির্বাচনে অকৃতকার্য হলেন। মানুষ এরকম লোককে নির্বাচনে ভোট দিতে চায় না। মানুষ মনে করে, এরকম লোকের জন্য নির্বাচনে দাঁড়ানো ঠিক না। আবার এই মানুষই চরিত্রহীন লোককে অপছন্দ করে, নির্বাচিত প্রতিনিধি দুর্নীতি করলে সেটা মেনে নিতে চায় না।

যারা নির্বাচনে দাঁড়িয়ে ইসলামের লেবাস পরিধান করে, ইসলামি কথা-বার্তা বলে, উন্নয়নের কথা বলে, দুর্নীতির বিপক্ষে কথা বলে তার প্রতি মানুষ সহজে আকৃষ্ট হয়ে যায়। অনেকে নির্বাচনের সময় সব সময় মাথায় টুপি পরেন, মসজিদে নামাজ আদায় করেন। মহিলা প্রার্থী হলে পর্দা করেন। মানুষ মনে করে, এরকম লোকই দরকার। অথচ এই লোকটিই নামাজ পড়ে না, মাথায় টুপি দেয় না— সেটা মানুষ দেখেছে। ওই মহিলাই বেপর্দা হয়ে চলাফেরা করেন। কিন্তু নির্বাচনের সময়কার এই ধার্মিকতা ও নীতি কথায় মানুষ দুর্বল হয়ে পড়ে লোকটির প্রতি। এটা সেই ব্রিটিশ আমলে ছিল, পাকিস্তান আমলেও ছিল। আজও আছে। ১৯৩৬ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগের

প্রতিদ্বন্দ্বী কৃষক প্রজা পার্টি। এ দলের নেতা ছিলেন শেরে বাংলা এ.কে ফজলুল হক। কৃষক প্রজা পার্টি তুলনামূলক জনবান্ধব ছিল। আর শেরে বাংলা ছিলেন সাধারণ মানুষের নেতা। তিনি সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করতেন, কৃষক-শ্রমিকের স্বার্থ আদায়ে সক্রিয় থাকতেন সব সময়। অন্যদিকে মুসলিম লীগের নেতারা ছিলেন অভিজাত শ্রেণির। তারা সাধারণ মানুষের সাথে খুব একটা মিশতেন না। কিন্তু ১৯৩৬ সালের নির্বাচনের পরিবেশ এমন ছিল যে, সাধারণ মানুষের সাথে না মিশলে এবং সাধারণ মানুষের কথা না বললে ভোট পাওয়া দুষ্কর হয়ে যাবে। মুসলিম লীগের নেতারা সাময়িকভাবে সাধারণ মানুষজনের সাথে মিশলেন, ধর্মীয় লেবাস ধারণ করলেন এবং ইসলাম রক্ষার কথা বলা শুরু করলেন জনগণের ভোট পাওয়ার জন্য। এতে তারা ফায়দা পেয়েছেন। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী^{৬৯} তখন মুসলিম লীগের নেতা ছিলেন। শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক ও তাঁর কৃষক প্রজা পার্টির মোকাবিলায় সোহরাওয়ার্দী তখন মাঠে নামলেন ইসলাম রক্ষার শ্লোগান নিয়ে।

ভারতীয় গবেষক ও লেখক জয়া চ্যাটার্জি লিখছেন—

‘সোহরাওয়ার্দী নিজে ততটা ধার্মিক ছিলেন না। তিনি ছিলেন নীতিজ্ঞান শূন্য; কিন্তু তিনি সাম্প্রদায়িক বা ধর্মভীরু ছিলেন না। তিনি শূকরের মাংস খেতেন, স্কচ পান করতেন এবং এক রাশিয়ান অভিনেত্রীকে বিয়ে করেন। ...তিনি তার অবসর সময়ে সুন্দরী মহিলাদের সঙ্গে নাচতেন, তাদের সঙ্গে উপভোগ করতেন, তাদের সাথে বাইরে বেড়াতে যেতেন, পশ্চিমা সংগীতের নামিদামি রেকর্ড শুনতেন— এরকম রেকর্ডের সংখ্যা তার এক হাজারেরও বেশি ছিল ...(এবং) তার ক্ষুদ্র মুভি ক্যামেরা দিয়ে তিনি ছবি তুলতেন।’

এই একই সোহরাওয়ার্দী এবং লীগের তার আধুনিক ও পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন সহকর্মীরা ইসলামের নামে নির্বাচনী লড়াইয়ে নেমে পড়লেন। কৃষকদের সত্যিকারের প্রতিনিধিত্বের দাবিদার কৃষক প্রজা পার্টির বিকল্প মুসলিম নেতৃত্বে চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে গিয়ে উচ্চশ্রেণির এই মুসলমানেরা অনেক লোকপ্রিয় পছন্দ অবলম্বন করতে বাধ্য হন।^{৭০} সামরিক উর্দি পরে ক্ষমতায় আসা আইয়ুব খান

^{৬৯}. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর জন্ম পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুরে ৮ সেপ্টেম্বর ১৮৯২ সালে। স্যার আবদুর রহিমের কন্যা নিয়াজ ফাতেমার সাথে বিয়ে হয় ১৯২০ সালে। তিন বছর পর নিয়াজ ফাতেমা মারা যান। ১৯৪০ সালে ভেরা টিসিস্কো নামে এক রুশ মহিলাকে বিয়ে করেন। ১৯৪৬ সালে তাদের বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে। ২০১৯ সালের মৃত্যুবরণ করা সোহরাওয়ার্দীর ছেলে রাশেদ সোহরাওয়ার্দী এই রুশ মহিলার ছেলে ছিলেন। মওলানা মোহাম্মদ আলি ও মওলানা শওকত আলির নেতৃত্বে পরিচালিত খেলাফত আন্দোলনে যোগ দিয়ে রাজনীতিতে প্রবেশ করেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, ১৯২০ সালে। ১৯২৪ সালে কলকাতা করপোরেশনের ডেপুটি মেয়র নির্বাচিত। ১৯৩৭ সালে দুটো আসন (কলকাতা দক্ষিণ ও চব্বিশপরগনা) থেকে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন এবং এ কে ফজলুল হকের কোয়ালিশন সরকারে বাণিজ্য ও শ্রমমন্ত্রী নিযুক্ত হন। ১৯৪৩-১৯৪৫ সালে খাজা নাজিমুদ্দিনের মন্ত্রিসভায় বেসামরিক সরবরাহমন্ত্রী, ১৯৪৬-৪৭ সালে অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী, ১৯৫৪-৫৫ কেন্দ্রীয় সরকারের আইনমন্ত্রী নিযুক্ত হন এবং ১৯৫৬-৫৭ সালে অবিভক্ত পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হন। ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সোহরাওয়ার্দীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ১৯৬৩ সালের ৫ ডিসেম্বর বৈরুতে মারা যান। তার মৃত্যু আজও রহস্যজনক।

^{৭০}. জয়া চ্যাটার্জি, *বাঙলা ভাগ হলো : হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা ও দেশ-বিভাগ*, প্রগুক্ত, পৃষ্ঠা-৯৩

তার ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার জন্য ইসলাম ধর্মকে ব্যবহার করেছেন। অন্যদিকে তিনি ইসলামি দলগুলোকে দমন করতে কঠিন ভূমিকা পালন করেন। জামায়াতে ইসলামীর আমির মাওলানা মওদুদীসহ তাঁদের অনেক নেতাকে জেলে ঢুকিয়েছিলেন।^{৭১} ভোটের রাজনীতির কথা চিন্তা করে আওয়ামী লীগ মুসলিম নাম নিয়ে পথচলা শুরু করে। ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন রোজ গার্ডেনের^{৭২} সম্মেলনে আওয়ামী মুসলিম লীগ^{৭৩} গঠিত হওয়ার সময় অলি আহাদ দলের নাম থেকে মুসলিম শব্দটি বাদ দেওয়ার প্রস্তাব করলেও কাজ হয়নি। অলি আহাদ নিজেই লিখছেন,

‘আমরা কতিপয় ছাত্র ব্যতীত আর সকলেই আওয়ামী মুসলিম লীগ নামকরণের ঘোর পক্ষপাতি।’^{৭৪}

ভোটের রাজনীতিতে বিপুল অর্থ ব্যয়, অপব্যয় ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে ছলচাতুরীর আশ্রয় নিতে হয়। এসব প্রবণতা যেমন ইসলামি আদর্শের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়, তেমনি সেগুলো না করলে নির্বাচনী সাফল্য লাভ করাও কঠিন। ইসলামি দলের বাইরেও যারা যোগ্য, তুলনামূলক সং, ভঙ্গুর গণতন্ত্রের এই রাজনীতি আর নির্বাচন ব্যবস্থায় তারা খুব একটা কাবু করতে পারেন না। কবি কাজী নজরুল ইসলামও নির্বাচন করে শুধু ফেলই করেননি, তাঁর জামানতও বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। তিনি ১৯২৬ সালে ফরিদপুর থেকে নির্বাচন করে পরাজিত হন। অবশ্য তার ফেল করার আরেকটা কারণ ছিল, কংগ্রেস তাকে নমিনেশন দিয়েও সেভাবে সহযোগিতা করেনি তাঁর মুসলিম পরিচিতি থাকার কারণে। বিষয়টি ডেইলি স্টারের একটা লেখায় ফুটে উঠেছে এভাবে-

To obtain Congress nomination, Nazrul visited Kolkata on October 26. However, he did not receive much help from Congress. Yet this lone fighter went ahead with the election even after repeated warnings from his friend Muzzafar Ahmed and as feared he miserably failed. After this incident, although Nazrul kept up the fire of his writing, his active participation in politics was not notable. His last appearance in political conference with Muzzafar Ahmed was in 1929 at Kushtia. Realising the communal nature of most political parties, Nazrul began to lean towards the cultural world in the 1930s.⁷⁵

^{৭১}. মহিউদ্দিন আহমদ, *লক্ষ্য হাসিলের জন্য যেকোনো পথই বৈধ!* দৈনিক প্রথম আলো, ১৫ জুন ২০১৭

^{৭২}. রোজ গার্ডেন- ১৯৪৯ সালের ২৩-২৪ জুনের কর্মী সম্মেলনে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয়। এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় কে.এম. বশীরের ঢাকার কে, এম, দাস লেনস্থ বাসভবনে। এই বাসভবনের নাম ছিল ‘রোজ গার্ডেন’।

^{৭৩}. পশ্চিম পাকিস্তানে মানকি শরিফের পির সাহেবের অনুকরণে সংগঠনের নাম আওয়ামী মুসলিম লীগ নামকরণের পরামর্শ দিয়েছিলেন। আওয়ামী মুসলিম লীগ হচ্ছে উর্দু ও ইংরেজির সমন্বয়ে। আওয়াম শব্দের অর্থ জনসাধারণ।

^{৭৪}. অলি আহাদ, *জাতীয় রাজনীতি : ১৯৪৫ থেকে ৭৫*, প্রাগুক্ত., পৃষ্ঠা-৯৭

^{৭৫}. Tamanna Khan, *Nazrul in Politics*, Daily Star, May 21, 2010

বাংলাদেশের প্রচলিত নির্বাচন ব্যবস্থা আদর্শিক দলগুলোর জন্য নির্বাচনে ভোটের আকৃষ্ট করার ক্ষেত্রে নেতিবাচক ভূমিকা রাখে। সেটা বামপন্থী দলই হোক, আর ইসলামপন্থী দলই হোক। দেখা যায় প্রচলিত দলগুলো ও এর নেতারা মানুষকে মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে, বিভিন্ন স্বপ্ন দেখিয়ে ভোটের আকৃষ্ট করে ফেলে। আদর্শিক দলগুলো এ কাজটি করতে পারে না। এটা তাদের আদর্শের সাথে যায় না। আর এখানকার গণতন্ত্র এমন যে, এখানে ভোট কারচুপির সুযোগ আছে। পেশিশক্তি প্রয়োগের সুযোগ আছে। দেশের মানুষ ইসলামের প্রতি দুর্বল। চরিত্রবান মানুষের প্রতি দুর্বল। কিন্তু দেখা যায় অনেক সময় অনেকে বেশ-ভূশা ধারণ করে মানুষের কাছে গিয়ে নিজেকে উপস্থাপন করলে মানুষ তাকে বিশ্বাস করে ফেলে এবং তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। শেখ মুজিবুর রহমান দীর্ঘ সময় রাজনীতি করে বাঙালির চরিত্রের বিষয়ে মন্তব্য করেছেন এই বলে—

‘অনেক সময় দেখা গেছে, একজন অশিক্ষিত লোক লম্বা কাপড়, সুন্দর চেহারা, ভালো দাড়ি, সামান্য আরবি ফারসি বলতে পারে, বাংলাদেশে এসে পির হয়ে গেছে। বাঙালি হাজার হাজার টাকা তাকে দিয়েছে একটু দুআ পাওয়ার লোভে। ভালো করে খবর নিয়ে দেখলে দেখা যাবে, এ লোকটা কলকাতার কোনো ফলের দোকানের কর্মচারী অথবা ডাকাতি বা খুনের মামলার আসামি। অন্ধ কুসংস্কার ও আলৌকিক বিশ্বাসও বাঙালির দুঃখের আর একটা কারণ।’^{৭৬}

বাংলাদেশের মানুষের এই যখন অবস্থা তখন রাজনীতির ক্ষেত্রেও তাদের এমন অবস্থা।

রাজনীতির ক্ষেত্রে জনগণ অন্য কথায় ভোটদেদের যে ভাবনা ও সিদ্ধান্ত তাতে ইসলামপন্থী দলগুলো এবং তুলনামূলক অন্যান্য ক্লিন ইমেজধারী দলগুলো ভালো করতে পারে না। সাংবাদিক ও কলামিস্ট আলতাফ পারভেজ যেমনটি লিখেন—

‘বাংলাদেশে এরূপ হতাশার মাত্রা আরও ব্যাপক। পরিবারভিত্তিক রাজনীতিই সদৃশে দাঁড়িয়ে আছে এখানে সুশীল উদ্যোগগুলোর ছাই-ভস্মের ওপর। শ্রীলঙ্কাতেও তাই। এই দুই দেশসহ পাকিস্তান-ভারতেও ভোটদেদের সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনে ভীষণ আগ্রহী হলেও দুর্নীতিগ্রস্ত এবং অপরাধপ্রবণ রাজনীতিবিদের উদারভাবে ভোট দিতে প্রস্তুত তাঁরা। যে রাজনীতিবিদেরা কার্যত খুদে খুদে গডফাদার হয়ে দেশগুলোকে ভাগ করে নিয়েছেন বলা যায়। রাজনৈতিক পরিসরের সর্বগ্রাসী দুর্নীতি বিষয়ে দক্ষিণ এশিয়ার শক্তিশালী কিছু প্রচারমাধ্যম যতটা সরব, সাধারণ মানুষ এ সমস্যাতে কতটা নিজ নিজ দেশের ভবিষ্যতের প্রধান প্রতিপক্ষ ভাবছে, সে প্রশ্নে সিদ্ধান্তে আসা কঠিন। দক্ষিণ এশিয়ার সমাজের এক মহা গোলকধাঁধা এটা। রাজনীতির সঙ্গে ধর্মের মেলবন্ধনেও এই অঞ্চলের ভোটদেদের খুব বেশি আপত্তি আছে বলে বাস্তব তথ্য মেলে না, যেমনটি দাবি প্রগতিশীল মহলের।’^{৭৭}

^{৭৬}. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪৮

^{৭৭}. আলতাফ পারভেজ, *রাজনীতির ধাঁধা : ছোটো দলগুলো কেন পারছে না?*, দৈনিক প্রথম আলো, ২৩ ডিসেম্বর ২০১৭

প্রচলিত গণতন্ত্র ও নির্বাচন ব্যবস্থায় ইসলামি দলগুলো যতটা না ভালো করে, যতটা না জনসমর্থন লাভ করে; দেশ পরিচালনায়, সরকারে কিংবা সংসদে তাদের প্রতিনিধিত্ব অনেক কম হয়ে থাকে। কারণ, বর্তমান প্রচলিত এই গণতন্ত্র ও নির্বাচন ব্যবস্থায় যারা একটু বেশি ভোট পায়, তারা সুযোগ-সুবিদা ভোগ করে তার চাইতে অনেক বেশি। যারা একটু কম ভোট পায়, তাদেরটা বাস্তবে আরও অনেক কমে যায়। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাক। ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে জামায়াতে ৮.৬৩% ভোট পেয়ে সংসদে আসন পায় মাত্র তিনটি। এটাকে যদি প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র বলা হয়, তাহলে জামায়াতে ইসলামীর তিনজন এমপির স্থলে সংসদে ২৬ জন এমপির প্রতিনিধিত্ব করার কথা ছিল। কারণ, ৩০০ আসনের ৮.৬৩% হয় ২৬টি আসন। ১৯৯১ সালের নির্বাচনে সংসদে জামায়াতের আসন ছিল ১৮টি। কিন্তু তারা ভোট পেয়েছে ১২.১৩%। ভোটের হিসেবে প্রতিনিধিত্বের ধারণা থেকে ৩০০ আসনের সংসদে তাদের আসন থাকার কথা ছিল ৩৬। ১৯৯১ সালের এ নির্বাচনে জাতীয় পার্টি সারাদেশে জামায়াতে ইসলামীর চেয়ে কম ভোট পেয়েও দ্বিগুণ এমপি নির্বাচিত হয়। অর্থাৎ ১৯৯১ সালের নির্বাচনে জাতীয় পার্টি থেকে ৩৫ জন এমপি নির্বাচিত হন। এ নির্বাচনে জাতীয় পার্টির প্রাপ্ত ভোট ছিল ১১.৯২%। অবশ্য শতকরা হিসেবে যদি আসন বণ্টন হতো তাহলে তারা ৩৫টি আসনই পেত।

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ সংসদে কখনো আসন পায়নি। নির্বাচন কমিশনের হিসেব অনুযায়ী তাদের জনসমর্থন ১৯৯৬ ও ২০০১ সালের নির্বাচনে ১%-এর বেশি ছিল। সে হিসেবে ৭ম ও ৮ম সংসদে তাদের তিনটি করে আসন থাকার কথা ছিল প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের ধারণা অনুযায়ী। জাকের পার্টি ১৯৯১ সালের নির্বাচনে ভোট পায় ১.২২%। সে হিসেবে তাদের ৩/৪টি আসন থাকার কথা ছিল। কিন্তু কোনো আসন পায়নি। ওই নির্বাচনে বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) জাকের পার্টির চাইতে কম জনসমর্থন অর্থাৎ সারাদেশে ১.১৯% ভোট পেয়ে ৫ জন এমপি নির্বাচিত হয় সিপিবি থেকে।

১৯৯১ সালের সেই নির্বাচনে বিএনপি ও আওয়ামী লীগ প্রায় সমপরিমাণ ভোট পায়। বিএনপি পায় ৩০.৮১% ভোট। অন্যদিকে আওয়ামী লীগ পায় ৩০.০৮% ভোট। কিন্তু বিএনপি আসন পায় ১৪০, জামায়াতের সমর্থন নিয়ে সরকার গঠন করে। আর আওয়ামী লীগ পায় ৮৮টি আসন, যা নিয়ে তারা বিরোধী দলে চলে যায়। প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের ধারণা অনুযায়ী বিএনপি ৯২টি এবং আওয়ামী লীগ ৯০টি আসন নিয়ে সংসদের প্রতিনিধিত্ব করার কথা ছিল। দুই দলই সমর্থনের চাইতে আসন পায় বেশি প্রচলিত গণতন্ত্র ও নির্বাচন ব্যবস্থার কারণে। ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে আওয়ামী ও বিএনপি প্রায় কাছাকাছি ভোট পেয়েও বলা হয় বিএনপির শোচনীয় পরাজয় হয়েছিল। আসলেই কি?

১৯৯৬ সালে ৭ম সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ৩৭.৪৪% ভোট পেয়ে ১৪৬টি আসন পায়, আর বিএনপি ৩৩.৬০% ভোট পেয়ে আসন পায় ১১৬ টি। অর্থাৎ ১৯৯১ সালের চাইতে ১৯৯৬ সালে

বিএনপির জনসমর্থন আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু আগের তুলনায় বেশি জনসমর্থন থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে বিরোধী দলে যেতে হয়। এই নির্বাচনেও অন্যান্য নির্বাচনের মতো আওয়ামী লীগ ও বিএনপি তাদের প্রাপ্ত শতকরা ভোটের হারের চাইতে আসন পায় বেশি। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ পেয়েছিল ৪৮.৬৭% আসন, আর বিএনপি পেয়েছিল ৩৮.৬৭% আসন। জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ঐক্যজোট যথাক্রমে ৮.৬১% এবং ১.০৯% ভোট পেয়ে আসন পায় ১% ও ০.৩৩%। জামায়াতে ইসলামী জনসমর্থনের চাইতে কয়েকগুণ কম আসন পায়। এই নির্বাচনে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) ইসলামী ঐক্যজোটের চাইতে তিন ভাগের এক ভাগেরও কম অর্থাৎ ০.২৩% ভোট পেয়ে আসন পায় ০.৩৩%।^{৭৮}

অদূরদর্শিতা, অস্থিরতা ও ঘন ঘন সিদ্ধান্ত পরিবর্তন

কোনো ফলাফল পাওয়ার পর কিছুটা সময় ধৈর্য ধরতে হয়। অপেক্ষা করতে হয়। নয়তো ফলাফল হাতছাড়া হয়ে যেতেও পারে। ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর সিপাহী-জনতার বিপ্লবের মধ্য জিয়াউর রহমান চলে আসেন ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে। এর মাত্র তিন দিন আগে খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে একটি সফল সামরিক অভ্যুত্থান হয়। সেনাপ্রধানের ব্যাজও পরিয়ে নেন তিনি। কিন্তু সে সফল বিপ্লব শীঘ্রই ব্যর্থ হওয়ার কারণগুলোর মধ্যে অনেকে তখনকার কিছু অস্থির সিদ্ধান্ত ও অদূরদর্শিতাকে উল্লেখ করেন। তেসরা নভেম্বরের সফল সামরিক অভ্যুত্থানের পরদিন অর্থাৎ ৪ নভেম্বর সকালে ঢাকায় আওয়ামী লীগের একটি আনন্দ মিছিল বের হয়। এ সম্পর্কে তখনকার ঢাকার স্টেশন কমান্ডার লে. কর্নেল (অব.) এম এ হামিদ পিএসসি বলেন—

আওয়ামী লীগের সেই মিছিলে খালেদ মোশাররফের মা ও ছোটো ভাই রাশেদ মোশাররফ নেতৃত্ব দেওয়ায় সবার কাছে খালেদের অভ্যুত্থান প্রো-আওয়ামী লীগ অভ্যুত্থান হিসেবে সেপাই জনতার কাছে চিহ্নিত হয়ে পড়ে। এটা খালেদের সম্পূর্ণ বিপক্ষে চলে যায়।^{৭৯}

তাদের এই ধারণার পেছনে যে যুক্তিটি কাজ করে তা হচ্ছে এই, খালেদ মোশাররফের ভাই রাশেদ মোশাররফ ছিলেন আওয়ামী লীগের এমপি এবং ৩ নভেম্বর অভ্যুত্থান সংঘটিত হওয়ার পরপরই রাশেদ মোশাররফ^{৮০} ও তার মায়ের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ মিছিল বের করে বঙ্গবন্ধু হত্যাকারীদের বিচার দাবি করে। এই অভ্যুত্থান ব্যর্থ হয়েছিল তার বিরুদ্ধে এইরূপ প্রচারণার কারণে যে, এটা ভারতীয় মদদপুষ্ট। অর্থাৎ খালেদ ও তাঁর ভাইয়ের অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব ভারত-সমর্থিত হিসেবে চিহ্নিত হয়ে গিয়েছিল এবং সেটাই অভ্যুত্থানের পরাজয়ের কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়।

^{৭৮} সূত্র : নির্বাচন কমিশন

^{৭৯} লে. কর্নেল (অব.) এম.এ. হামিদ পিএসপি, *তিনটি সেনা অভ্যুত্থান ও কিছু না বলা কথা*, (ঢাকা : কালিকলম প্রকাশন, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১২), পৃষ্ঠা-৯৬

^{৮০} রাশেদ মোশাররফ ১৯৯৬-২০০১ সরকারে শেখ হাসিনার মন্ত্রিসভায় ভূমিমন্ত্রী ছিলেন। খালেদ মোশাররফের মেয়ে মাহজাবিন খালেদ দশম সংসদে আওয়ামী লীগের সংরক্ষিত মহিলা সংসদ সদস্য ছিলেন।

৪ নভেম্বর ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন যৌথভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এই অভ্যুত্থানের সমর্থনে মিছিল করে। এই মিছিলও নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। অনেকে মনে করেন ১৫ আগস্ট ক্ষমতাচ্যুতদের এবং একটি প্রতিবেশী রাষ্ট্রের প্রভাব পুনঃস্থাপনের জন্যই এ অভ্যুত্থান। ৪ নভেম্বর সকালে খালেদ মোশাররফের মায়ের নেতৃত্বে যে মিছিল বেরিয়েছিল হতে পারে তা খালেদ মোশাররফের বিজয় উদ্‌যাপনের মিছিল ছিল। কিন্তু বিরাজমান পরিস্থিতির কারণে জনমনে এ ধারণা তৈরি হয়েছিল যে, এটি আসলে ক্ষমতা হারানো ভারতপন্থীদের মিছিল। খালেদ মোশাররফ ও তাঁর সহযোগীরা স্বাধীনতা-উত্তর একটি দেশে যে সামরিক অভ্যুত্থান করতে যাচ্ছেন, তার নাম রেখেছিলেন ‘অপারেশন প্যাস্কার’।^{৮১} একটি সামরিক অভ্যুত্থানের এরূপ নামকরণও হিতে বিপরীত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অনেকে অপারেশনের এই নামকরণের মধ্যে স্পষ্ট রাজনৈতিক ঘোষণার কথা বলেন। খালেদ মোশাররফের সেই সফল সামরিক অভ্যুত্থান ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় এই অস্থিরতা আর অদূরদর্শিতার কারণে।

অস্থিরতা আর ঘন ঘন সিদ্ধান্ত পরিবর্তন এ দেশের জনমানুষ থেকে দূরে রাখছে ইসলামি দলগুলোকে। স্বাধীনতার পরপর রাজনীতিতে নিষিদ্ধ থেকেও যখন জিয়াউর রহমানের আমলে রাজনীতি করার সুযোগ পায় ইসলামি দলগুলো, তখন তারা ইসলামিক ডেমোক্র্যাটিক লীগ (আইডিএল) গঠন করে। সুযোগ পেয়েও নিজ নামে না এসে ১৯৭৯ সালের নির্বাচনে আইডিএল-এর ব্যানারে অংশগ্রহণ করে। কিছুদিন পরেই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে জামায়াতে ইসলামী আবির্ভূত হলো নিজ নামে। অনেকে দূরদর্শী চিন্তা থেকে জামায়াতে ইসলামীর নিজ নামে আবির্ভাবকে মেনে নেননি। তার মধ্যে মাওলানা আব্দুর রহীমও ছিলেন। তিনি মনে করতেন, জামায়াতে ইসলামী নিজ নামে আবির্ভূত হলে একসময় দল হিসেবেও এ দলকে যুদ্ধপরাধে অভিযোগে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হতে পারে এবং দলের ওপর একাত্তরের তকমা লাগিয়ে দলকে ঘায়েল করা হতে পারে। মাওলানা আব্দুর রহীমের যুক্তি ছিল যে, যেহেতু ১৯৭৩ সালে সংবিধানে সংশোধনি এনে একাত্তরের যুদ্ধাপরাধের বিচারের জন্য যুদ্ধাপরাধ ট্রাইবুনাল গঠনের বিধান করা হয়েছে, সেহেতু কোনো সুযোগে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল গঠন করে জামায়াতে ইসলামী ও এর নেতাদের বিচারের আওতাধিন করা হতে পারে। একাত্তরের ভূমিকার জন্য শেখ মুজিবুর রহমান সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার পরও এই প্রতিশন সংবিধানে রাখা হয়। এতে মাওলানা আব্দুর রহীম এটা বুঝতে পেরেছিলেন যে, তখনকার প্রেক্ষাপটে বিচার করা কঠিন, বিধায় সুযোগ পেলে এটা করা হবে বলে সে প্রতিশন সংবিধানে রেখে দেওয়া হয়েছে। এটা ছিল তাঁর দূরদর্শিতা। কিন্তু সে সময় অনেকে মাওলানা আব্দুর রহীমকে অদূরদর্শী হিসেবে মনে করেছিলেন। মাওলানা আব্দুর রহীম আর জামায়াতে না ফিরে আইডিএল-এ রয়ে গেলেন। শুধু মাওলানা আব্দুর রহীম নন, জামায়াতে ইসলামীর আরও অনেকে স্বাধীন বাংলাদেশে ভিন্ন প্রেক্ষিতে পাকিস্তানি আমলের রাজনীতি বর্জন করে নতুনভাবে যাত্রা শুরু করতে চাইলেন। দলকে পুনর্জাগরিত করার ব্যাপারে

^{৮১}. জাফর ইমাম বীর বিক্রম, *দাম দিয়ে কিনেছি এই বাংলা*, (ঢাকা: ঐতিহ্য প্রকাশনী, ২০১৬), পৃষ্ঠা-১৩৭

অনেকের অনিচ্ছা থাকলেও গোলাম আযমসহ অনেকে স্বনামেই আবার যাত্রা শুরু করতে চাইলেন।^{৮২} সেটাই হলো। মাওলানা আব্দুর রহীমের সাথে আরও কেউ কেউ আইডিএল-এ রয়ে গেলেন। পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক দলবিধির অবলুপ্তির সুযোগে নেজামে ইসলামসহ অনেকে নিজেদের পুরনো দল পুনরুজ্জীবিত করে নবতর ঐক্যবদ্ধ দল আইডিএল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।^{৮৩}

হেফাজতে ইসলাম ২০১৩ সালে শাপলা চত্বরে বিশাল সমাবেশ করে। সেই সমাবেশ সরকারের বিপক্ষে ছিল। এই সমাবেশ ব্যাপক আলোচিত সমালোচিত হয়। কিন্তু হেফাজতের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন, অবস্থান পরিবর্তন হতে দেয়নি। ২০১৭ সালে এসে আবার আওয়ামী লীগের সাথে সখ্যতা গড়ে। রাজনৈতিক ফায়দা লাভের জন্য ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে আওয়ামী লীগের এ ধরনের সম্পর্কের ইতিহাস নতুন নয়। প্রশ্ন হলো, কেন আওয়ামী লীগ ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে এ ধরনের সম্পর্ক গড়ে তোলে? আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সাবেক সদস্য নুহ উল আলম লেনিন একটি টেলিভিশন টকশোতে কওমি মাদরাসার আলেমদের সাথে প্রধানমন্ত্রীর বৈঠককে উল্লেখ করেছিলেন একটি ট্যাকটিকস বা কৌশল হিসেবে। তার মতে, কওমি আলেমদের দূরে ঠেলে না দিয়ে ধীরে ধীরে একটি সেক্যুলার শিক্ষাব্যবস্থার দিকে ফিরিয়ে আনতে হবে।^{৮৪} ২০০৬ সালে খেলাফত মজলিসের সাথে আওয়ামী লীগ একই লক্ষ্য নিয়ে চুক্তি করেছিল। তবে যে লক্ষ্য সামনে রেখে ইসলামপন্থীদের সাথে আওয়ামী লীগের কৌশলগত সম্পর্ক গড়ে উঠুক না কেন, তাতে ইসলামপন্থীদের লাভবান হওয়ার বেশি সম্ভাবনা নেই। জামায়াতের সাথে আওয়ামী লীগের সম্পর্ক জামায়াতের জন্য সুখকর তো হয়নি; বরং বলা যায় অনেক বেশি মূল্য দিতে হয়েছে।^{৮৫} ১৯৯৬ সালের নির্বাচনের আগে ইসলামী ঐক্যজোটও সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে বিএনপির বিরুদ্ধে মাঠে নামতে চেয়েছিল। পঞ্চম সংসদে ঐক্যজোটের একমাত্র প্রতিনিধি মাওলানা ওবায়দুল হককে তাঁর সংসদ সদস্য পদ থেকে পদত্যাগ করানোর সিদ্ধান্ত নেয় জোটের শরিক দলগুলো। কিন্তু খেলাফত মজলিস এককভাবে এ পদত্যাগের বিপক্ষে অবস্থান নেয়। তখনই মূলত ইসলামী ঐক্যজোটে দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে রূপ নেয়। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইসলামী ঐক্যজোট থেকে বেরিয়ে যায় শায়খুল হাদিসের দল খেলাফত মজলিস। তবে কিছুদিন পরে আবারও যোগ দেয় জোটে।

দূরদর্শিতা, স্থিরতা, সিদ্ধান্তে অটল থাকা ইসলামি আন্দোলনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বাংলাদেশের ইসলামি রাজনৈতিক দল কিংবা গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বেশ অস্থিরতা বিদ্যমান। পরস্পরবিরোধী স্বার্থের ক্ষেত্রে স্বল্পমেয়াদি স্থলে দীর্ঘমেয়াদি অথবা স্থায়ী স্বার্থ,

^{৮২}. একাত্তরে আমরা ভুল করিনি - গোলাম আজম ও জামায়াতের রাজনীতি, সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ১৯৮১ সালের ১৭ এপ্রিল প্রকাশিত, প্রতিবেদনটি লিখেছিলেন-মাহফুজ উল্লাহ, আহমেদ নূরে আলম, শেহাব আহমেদ, মতিউর রহমান চৌধুরী

^{৮৩}. এসএম সাখাওয়াত হুসাইন, ইসলামি রাজনীতিতে মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, দৈনিক ইনকিলাব, অক্টোবর ১, ২০১৬

^{৮৪}. আলফাজ আনাম, ইসলামপন্থীদের সাথে আওয়ামী লীগের সংযোগ, দৈনিক নয়াদিগন্ত, ২৫ এপ্রিল ২০১৭

^{৮৫}. আলফাজ আনাম, প্রাপ্ত

তুচ্ছ স্বার্থের স্থলে প্রকৃত স্বার্থ এবং অনিশ্চিত স্বার্থের পরিবর্তে সুনিশ্চিত স্বার্থের ওপর অগ্রাধিকার না দিলে মাশুল দিতে হয়। ইসলামি দলগুলো যে নবির আদর্শ ধারণ করে সেই নবি আন্দোলন পরিচালনায় দূরদর্শী ছিলেন। কঠিন মুহূর্তে অস্থির সিদ্ধান্ত না নিয়ে স্থির সিদ্ধান্ত নিতেন। হুদায়বিয়ার সন্ধিতে তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় সেভাবে ফুটে ওঠে। সেই দূরদর্শিতার ফলাফলও পেয়েছেন।

হজরত মুহাম্মদ (সা.) সে সময় প্রকৃত, মৌলিক, ভবিষ্যৎ ও স্থায়ী স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। এটা করতে গিয়ে তাকে অনেক ছোটো ছোটো স্বার্থকে বিসর্জন দিতে হয়েছে। তিনি এমন এমন শর্ত মেনে নিয়েছিলেন যা মনে হয় উসকানিমূলক এবং প্রথম নজরেই মুসলমানদের জন্য অন্যায় ও অবমাননাকর। এমন শর্ত হজরত মুহাম্মদ (সা.) ছাড়া অন্য কেউ হলে কখনো ছাড় দিত না। তিনি ছিলেন অনেক দূরদর্শী। তিনি এসব শর্তের মাঝে স্থায়ী স্বার্থ দেখেছিলেন। দেখেছিলেন তাঁর আন্দোলনের এক বড়ো বিজয়। তিনি ‘পরম করুণাময় আল্লাহর নামে’ তুলে ফেলতে সম্মত হয়েছিলেন। সে স্থলে লেখা হয়েছিল ‘হে প্রভু, আপনার নামে।’ তিনি চুক্তিতে ‘আল্লাহর রাসূল’ কথাটি উল্লেখ না করে কেবল তাঁর নাম ‘মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ’ লিখতেও রাজি হন। এরকম বহু উদাহরণ রয়েছে। মহানবি (সা.) মক্কা বিজয়ের বিষয়টি গোপন রাখতে চেয়েছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল তাঁর বাহিনীর সংখ্যা, শক্তি ও গন্তব্য সম্পর্কে কাউকে কিছু না বলা। এজন্য মোহাম্মাদ (সা.) বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবক দলকে নির্দেশ দিলেন মদিনায় সমবেত না হওয়ার জন্য।^{৮৬}

একটু অস্থির হওয়ায় আল্লাহর রাসূলের জীবদ্দশায় উহুদ যুদ্ধে বিপর্যয় ঘটে। রাসূলে আকরাম (সা.) স্বয়ং এই প্রতিরক্ষা যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন। মুসলিম শিবিরের বাঁ পাশে পাহাড়ে একটি সুড়ঙ্গপথ ছিল। নবিজি (সা.) ৫০ জনের একদল তিরন্দাজকে এই গিরিপথের পাহারায় নিযুক্ত করেন এবং বলেন, আমাদের জয়-পরাজয় যা-ই হোক, তোমরা এই স্থান পরিত্যাগ করবে না। উহুদে যেন বদরের পুনরাবৃত্তি ঘটল। কুরাইশরা রণে ভঙ্গ দিয়ে পালাতে লাগল। এসময় মুসলিমগণ গনিমত সংগ্রহে প্রবৃত্ত হলো। গিরিরক্ষী তিরন্দাজদের ১২ জন বাদে বাকি ৩৮ জন যুদ্ধ শেষ মনে করে স্থান ত্যাগ করে সম্পদ সঞ্চয়ে মত্ত হলো। এই সুবাদে কুরাইশবাহিনী গিরি অতিক্রম করে মুসলমানদের পেছন দিক থেকে আক্রমণ করে ছত্রভঙ্গ করে দিলো। অনাকাঙ্ক্ষিত এই পরিস্থিতিতে মুসলমানগণ দিগিবিদিক ছুটেতে লাগল। মুসআব ইবনে উমায়ের ও নবিজির চাচা হামজা শহিদ হলেন। নবিজির নির্দেশ উপেক্ষাকারীদের ভুলের মাশুল দিতে হলো। বর্বর কুরাইশ যোদ্ধারা নবিজির ওপর সর্বাত্মক আক্রমণে বাঁপিয়ে পড়ল। নির্মম নির্দয় হামলায় তাঁর জীবন বিপন্নপ্রায়। সাহায্যে কিরাম নিজেদের জীবন বাজি রেখে, নিজেদের বুককে ঢাল বানিয়ে নবিজিকে রক্ষার প্রাণপণ চেষ্টা করতে থাকলেন। হামজার হত্যাকারী ইবনে কামিয়া নবিজিকে তরবারি দ্বারা কঠিন আঘাত করল। নবিজি অচেতন হয়ে পড়ে গেলেন।

^{৮৬}. মেজর জেনারেল (অব.) সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম বীরপ্রতীক, *দ্য ব্যাটেলস অব ইসলাম*, প্রাপ্ত, পৃষ্ঠা-৬১

কুরাইশরা ‘মুহাম্মাদ নিহত!’ বলে উল্লাস করতে লাগল। মাসআব (রা.)-এর চেহারার সঙ্গে নবিজির মিল থাকায় এই গুজব ডাল-পালা মেলল।^{৮৭}

উহুদের ঘটনা ছিল একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা। রাসূলের যুগে এমন উদাহরণ আর খুব একটা মেলে না। কিন্তু বাংলাদেশের ইসলামপন্থীরা অস্থির। ইসলামকে বোঝার ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে তারা ভিন্ন। তাদের রয়েছে উচ্চ আশা। মুখ্য বিষয়ের আগে গৌণ বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দেয়। এতে নিজেদেরই ক্ষতি হচ্ছে। রাজনৈতিক দলগুলোতে অস্থিরতা পরিহার ও দূরদর্শী সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে ভালো নেতৃত্ব প্রয়োজন। নেতৃত্বের দুর্বলতায় ঘন ঘন সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হয়। অস্থির আর দুর্বল নেতৃত্ব একটি দলকে তার সঠিক মানের ওপর স্থিতিশীল রাখতে পারে না।

পঁচাত্তরের পট পরিবর্তনের পর জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এসে ধর্মভিত্তিক রাজনীতিসহ বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রবর্তন করলে দেখা যায় এ সুযোগে ইসলামি দলগুলো অস্থির হয়ে ওঠে। তাদের চাওয়া যেন দ্রুত বাস্তবায়ন করতে চায়। জিয়াউর রহমান ছিলেন সেনাপ্রধান ও প্রধান আইন প্রশাসক। তখন বিমান বাহিনী প্রধান এবং ডেপুটি চিফ মার্শাল আইন প্রশাসক ছিলেন এয়ার ভাইস মার্শাল এমএ জি তোয়াব। তিনি জামায়াতের প্রতি সহমর্মী ছিলেন। সে সময় জামায়াতের লোকজন ইসলামি ব্যানারে একটি সভা আয়োজন করে। এমএজি তোয়াব সে সভায় যোগ দেন। ইসলামের প্রতীক হিসেবে চাঁদ-তারা খচিত জাতীয় পতাকা প্রবর্তনের দাবি জানানো হয় সে সভায়। সেখানে শ্লোগান উঠে ‘তোয়াব ভাই তোয়াব ভাই-চাঁদ-তার মার্কী পতাকা চাই।’ এমএজি তোয়াবের এ দাবির প্রতি সমর্থন থাকায় তাকে পদত্যাগ ও দেশত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়।^{৮৮} সে সময় অস্থির না হয়ে একটু ধৈর্য ধরলে, একটু দূরদর্শিতার পরিচয় দিলে তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল এমএজি তোয়াবকে এভাবে বিদায় নিতে হতো না। তিনি হয়তো সরকারের থেকে তাদেরকে আরও বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করতে পারতেন।

আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট, জনমানস ও বৈষয়িক স্বার্থ

একটি দেশের আর্থ সামাজিক অবস্থা সে দেশের রাজনীতির গতি-প্রকৃতির নির্ণয়ে বেশ ভূমিকা রাখে। বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি দরিদ্র দেশ। এরকম দেশে জনগণের কাছে আদর্শিক রাজনীতির বিকাশ সহজে হয় না। রাজনীতির কাঠামো সহজে বিকশিত হয় না। সেখানে ইসলামি রাজনীতি কীভাবে প্রভাব বিস্তার করবে? রাজনীতির কাঠামো বিকশিত হওয়ার পথে প্রধান অন্তরায় হচ্ছে এই আর্থ-সামাজিক অবস্থা, জনগণের অসচ্ছল অবস্থা। এ দেশের রাজনৈতিক দলের অপরিণত কাঠামো ও নৈতিক অবক্ষয়ের জন্যে প্রচলিত আর্থ-সামাজিক অবস্থাও কম দায়ী নয়।

^{৮৭}. গোলাম মোস্তফা, *বিশ্বনবী*, পৃষ্ঠা : ১৬৯-১৮৯

^{৮৮}. Bhuiyan Md. Monoar Kabir, *Politics and Development of The Jamaat-e-Islami*, (Dhaka: AH Development Publishing House, 2006), pp, 34

জন-সাধারণের সীমাহীন দারিদ্র্য, জাতীয় সম্পদের অপ্রতুলতা, বিভিন্ন গ্রুপ, গোষ্ঠী ও শ্রেণির মধ্যে কোন্দল, সর্বোপরি সর্বোচ্চ পর্যায়ের রাজনৈতিক-প্রশাসনিক এলিট থেকে শুরু করে গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত পোশাক-আশ্রিত সম্পর্কের বিস্তৃত জাল বিভিন্ন পর্যায়ে সাংগঠনিক দুর্বলতার জন্ম দিয়েছে।^{৮৯}

ইসলামি রাজনীতিতে যেহেতু দুর্নীতির সুযোগ নেই, এসব দলে বৈষয়িক স্বার্থের বিষয়টি খুব একটা গুরুত্ব পায় না। সাধারণ মানুষের একটি বড়ো অংশ বৈষয়িক স্বার্থের পেছনে ঘোরে। বিশেষ করে বর্তমান প্রেক্ষাপটে বৈষয়িক স্বার্থের দিকে মানুষ আরও বেশি ঝুঁকছে। অনেকে মনে করে, ইসলামি দল করে কী হবে? লাভ নেই। অন্যান্য দল করলে কিছুটা লাভবান হওয়া যাবে। এসব কারণে একটি অংশ বুর্জোয়া রাজনৈতিক দলের সদস্য হয়।

অনেক রাজনৈতিক দল এবং নেতা আছেন যাদের কাছে রাজনীতি করা একটি লাভজনক পেশা। রাজনীতি করে প্রচুর অর্থ-বিত্তের মালিক হচ্ছেন। রাজনৈতিক পরিচিতি ব্যবহার করে প্রভাব খাটাচ্ছেন এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিদা আদায় করছেন। এজাতীয় চরিত্রের লোকজন বেশির ভাগ বুর্জোয়া দলগুলোকে তাদের বৈষয়িক স্বার্থ হাসিলের জন্য বেছে নেয়। ইসলামি দলগুলোতে এসবের সুযোগ থাকে না।

ইসলামি দলগুলোর ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক দৈন্যতাও একটা কারণ হতে পারে। এসব দলের যারা সদস্য হন, তাদের একটি বড়ো অংশ সাধারণত অর্থনৈতিক সমস্যায় জর্জরিত থাকেন। অর্থনৈতিক সমস্যা থাকলে দেখা যায় অনেক সময় দলীয় কর্মসূচি বাস্তবায়ন কঠিন হয়ে পড়ে, একজন নেতার জন্য দলীয় প্রভাব বিস্তার করা কঠিন হয়ে পড়ে।

অন্যদিকে এ দেশের জনমানস ইসলামি রাজনীতির অনুকূল নয়। মানুষের মধ্যকার পারস্পরিক আস্থা, প্রথাগত আচরণ, সমন্বিত কার্যকলাপ, পারস্পরিক সামাজিক লেন-দেন, চলা-ফেরা, উঠা-বসা, সামাজিক সম্পর্কজাল প্রস্তুতকারক সামাজিক সংগঠনসমূহের বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি হচ্ছে সামাজিক পুঁজি। বাংলাদেশে সামাজিক পুঁজির ঘাটতি রয়েছে। পারস্পরিক হিংসা-বিক্রোধ এখানে অনেক বেশি। অপরের উন্নতি সহ্য করা ও মন থেকে অপরের জন্য কল্যাণ কামনার বিষয়টি জনগণের মধ্যে কম পরিলক্ষিত হয়। ১৯৮০-এর দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা ড. ইউএবি রাজিয়া আক্তার বানু তাঁর এক গবেষণার সমীক্ষায় দেখিয়েছেন যে, বাংলাদেশের মানুষের মধ্যকার পারস্পরিক আস্থা অত্যন্ত কম। তাঁর সমীক্ষা অনুযায়ী গ্রামাঞ্চলের মাত্র ৪.৫ শতাংশ জনগোষ্ঠী একে অপরকে বিশ্বাস করে। শহরাঞ্চলে পারস্পরিক আস্থার হার ২.৫ শতাংশ।^{৯০} প্রতিলিপনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গ্রামাঞ্চলে ৩৭ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলের ৪৪.৯ শতাংশ লোক একে অপরকে বিশ্বাস করে। বাংলাদেশের মানুষ সামাজিক পুঁজির দিক থেকে ভারত ও পাকিস্তান থেকেও পিছিয়ে আছে।

^{৮৯}. প্রফেসর এমাজউদ্দীন আহমদ, *বাংলাদেশে গণতন্ত্রের সংকট*, (প্রকাশক : সুলতান আহমদ, সন : ১৯৯১), পৃষ্ঠা-১৫

^{৯০}. আকবর আলী খান, *অবাক বাংলাদেশ : বিচিত্র ছলনাজালে রাজনীতি*, (ঢাকা : প্রথমা প্রকাশন, ২০১৭), পৃষ্ঠা-৩৬

নিচের সারণি দেখলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, আসলেই বাংলাদেশের মানুষ সামাজিক পুঁজির দিক থেকে কতটা পিছিয়ে আছে। ১৯৯৯-২০০১ সময়কালে এ সমীক্ষা চালানো হয়।

সারণি : বিভিন্ন দেশে সামাজিক পুঁজির পরিমাণ

দেশ	কত % লোক অন্যকে বিশ্বাস করে	দেশ	কত % লোক অন্যকে বিশ্বাস করে
ডেনমার্ক	৬৬.৫	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৩৫.৮
ইরান	৬৫.৩	পাকিস্তান	৩০.৮
চীন	৫৪.৫	দক্ষিণ কোরিয়া	২৭.৩
ভিয়েতনাম	৪১.৩	নাইজেরিয়া	২৫.৬
ভারত	৪১	বাংলাদেশ	২৩.৫

উৎস : ড. আকবর আলি খানের ‘অবাক বাংলাদেশ : বিচিত্র ছলনাজালে রাজনীতি থেকে সংগৃহীত বাংলাদেশের মানুষের সামাজিক পুঁজির ঘাটতির দিক থেকে পিছিয়ে থাকার কারণে এর প্রভাব রাজনীতিতেও পড়ে। মানুষ এখানে রাজনীতিবিদদের ওপর স্থায়ী আস্থা রাখতে পারে না। কোনো এক নেতা এসে জ্বালাময়ী ভাষণ দিলে দেখা যাবে অনেকের মন গলে যায়। আবার পরক্ষণেই তার প্রতি অনাস্থার পরিবেশ তৈরি হয় এই মানুষজনের মধ্যে। কিন্তু ততক্ষণে সে তার ভোট নিয়ে নিয়েছে। নেতারা এভাবে প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে জনসমর্থন আদায় করে।

অন্যদিকে, জনগণের একটি ভালো অংশের মধ্যেও প্রতারণার বীজ লুকায়িত। সুযোগ পেলেই সে প্রতারণার আশ্রয় নেয়। একজন মানুষ প্রতারিত হয়ে প্রতারক ও প্রতারণাকে যতটা ঘৃণা করে সুযোগ পেলে সে-ই আবার এর চাইতে কম প্রতারণা করে না। আর এই প্রতারণা, পারস্পরিক আস্থার অভাব, হিংসা-বিদ্বেষের কারণে ব্রিটিশ শাসনমালে বাঙালিদের মধ্যে উপদলীয় কোন্দল ও দলাদলি অনেক বেড়ে যায়। দীর্ঘদিন ধরে এখানে অবিশ্বাসের ঐতিহ্য লালিত হয়।^{৯১} বাঙালি বলতে শুধু বাংলাদেশি নয়। অপার বাংলার বাঙালিও। এই দুই বাংলার বাঙালিদের সম্পর্কে পৃথিবীর অপরাপর দেশের ধারণা ইতিবাচক নয়। এই নেতিবাচক ধারণা বহু আগে থেকেই। ষোড়শ শতাব্দীর পর্তুগিজ পর্যটক টম পিয়োরেস বাঙালি সম্পর্কে লিখেন, ‘দূরপ্রাচ্যের লোকেরা বিশ্বাস করে বাঙালিরা বিশ্বাসঘাতক।’ আর ইংরেজ শাসনামলে লর্ড মেকলে বাঙালির চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লিখেন, ‘মহিষের যেমন শিং আছে, মৌমাছির যেমন ছল আছে, সংগীতে যেমন সৌন্দর্য মেয়েদের, তেমনি বাঙালিদের বিশেষত্ব প্রতারণা।’^{৯২}

^{৯১}. আকবর আলী খান, অবাক বাংলাদেশ : বিচিত্র ছলনাজালে রাজনীতি, (ঢাকা : প্রথমা প্রকাশন, ২০১৭), পৃষ্ঠা-৩২

^{৯২}. Nirad C Chaudhuri, *Thy Hand, Great Anarch! India, 1921-1952*, (Boston: Wesley Publishing Company, 1987), p.182

আদর্শচ্যুতি, উন্নত চরিত্র ও নৈতিকতার ঘাটতি

প্রচলিত ধারার রাজনীতির সফলতার পথে উন্নত নৈতিক চরিত্রের বিষয়টি অন্তরায় হিসেবে খুব একটা কাজ করে না। অবশ্য তাদের উন্নত চরিত্রের অনুপস্থিতির মধ্য দিয়ে তারা রাষ্ট্রক্ষমতায় বসলে রাষ্ট্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়, জনগণ প্রতারিত হয়। কিন্তু তারপরও তাদের সাময়িক বা বাহ্যিক সফলতা এনে দেয়। বুর্জোয়া রাজনৈতিক দলগুলোর বিশেষ কোনো আদর্শের প্রতি অনুরাগ না থাকায় তাদের আদর্শচ্যুতির বিষয়টিও ধর্তব্য নয়। কিন্তু আদর্শিক সংগঠনের নেতা-কর্মীদের জন্য উন্নত নৈতিক চরিত্র ও আদর্শের ওপর অটল থাকার বিষয়টি অপরিহার্য। সকল ক্ষেত্রে বুর্জোয়া দলগুলোও বেশি সময় টিকতে পারে না দ্বিমুখিতা নিয়ে। মুসলিম লীগ তার উদাহরণ। অলি আহাদের ভাষায়, ‘১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগের শোচনীয় পরাজয়ের মূল কারণ, খোলাফায়ে রাশেদিনের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ইসলামি অনুশাসন মোতাবেক রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে রূপায়িত করিবার ওয়াদার প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা। মুসলিম লীগ সরকার উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের যোগসাজশে সমগ্র দেশকে বিভিন্ন পন্থায় দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, অবিচার, মুনাফেকি ও চরিত্রহীনতার অতল পক্ষে নিমজ্জিত করিয়াছেন।’^{৯৩}

ইসলামি সংগঠন ছাড়াও আদর্শিক ধারার আরও বিভিন্ন আন্দোলন, রাজনৈতিক সংগঠন আছে। স্বাভাবিকভাবেই ইসলামি সংগঠনের নেতা-কর্মীদের কাছে মানুষ উন্নত নৈতিক চরিত্র একটু বেশিই আশা করে। মানুষ তাদের মধ্যে কথা ও কাজের মিলের সংগতি দেখতে চায়। কিন্তু বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে দেখা যায়, ইসলামি আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের একটি বড়ো অংশের মধ্যে সে ধরনের নৈতিক গুণাবলি নেই। মানুষ অনেক সময় কাউকে দেখে একটি আন্দোলনে সম্পৃক্ত হয়। আবার কোনো কোনো সময় কারও অসদাচরণে সে আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়ায়। ইসলামি আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের মধ্যে অনেকের লোভ মানুষের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। দেখা যায়, একশ্রেণির নেতা-কর্মীর মধ্যে বুর্জোয়া আচরণ বিদ্যমান। ক্ষমতার অপব্যবহারের মানসিকতা বিদ্যমান। মানুষ ভাবে, এদেরকে ক্ষমতায় দিলে কী যে হবে? এরা কি কম করবে অন্যদের চাইতে?

ইসলামি দলগুলোতেও অনেক সময় নেতৃত্ব নির্বাচন করা হয় তোষামোদ আর অন্ধ আনুগত্যের ভিত্তিতে। আনুগত্য করা ফরজ এমন কথা বলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায়, অযোগ্য এবং তুলনামূলক কম নৈতিক গুণাবলিসম্পন্ন অনেককে পদে বসানো হয়। এতে বাইরের লোকের কথা তো পরে, নিজ দলের কর্মীদেরও বিষয়টি মেনে নিতে কষ্ট হয়। ইসলামি নৈতিকতা ও বৈষয়িক যোগ্যতার ভিত্তিতে নেতৃত্ব নির্বাচন না করার কারণে অনেক কর্মী-সমর্থক আস্তে আস্তে আরও নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। তাকওয়া ও বৈষয়িক যোগ্যতার মাপকাঠিতে দায়িত্ব না দিয়ে নিজ পছন্দকে মাপকাঠি বানানো ইসলামসম্মত নয়। অনেক সময় ইসলামি আন্দোলনের অনেক নেতা-কর্মীর মধ্যে লোক দেখানো ইবাদত ও নৈতিকতা প্রদর্শন লক্ষ্য করা যায়।

^{৯৩}. অলি আহাদ, জাতীয় রাজনীতি : ১৯৪৫ থেকে ৭৫, প্রাপ্ত, পৃষ্ঠা-১৮৬

ইসলামি সংগঠনের নেতা-কর্মীদের মধ্যে কোনো সন্দেহসূচক প্রশ্ন সৃষ্টি হলে সেটা সাধারণ জনগণের মধ্যে প্রভাব ফেলে। কিছু কিছু ইসলামি দল আছে এমন যে, দলের ব্যবস্থা এমনভাবে সাজানো যেখানে সন্দেহজনক প্রশ্ন সৃষ্টির পরিবেশ দূর করার পরিবর্তে গঠনতন্ত্র ও দলীয় সিস্টেম অনুযায়ী সেটা আরও লালন করা হয়। নেতা বা দলের কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করতে গেলে কিছু প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এগোতে হয়। সে প্রক্রিয়া মেইনটেইন করতে গিয়ে অনেক সময় অভিযোগকারী নিজেই প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যান আর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি থেকে যান অভিযোগের বাইরে। নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপনের সহজ সুযোগ থাকা উচিত। নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ যিনিই উত্থাপন করুন তা অবশ্যই যাচাই করা উচিত এবং অভিযোগ সত্য হলে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা কর্তব্য। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় এটা হয় না। নেতাকে রক্ষা করার জন্য নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ আমলে না নিয়ে বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়া হয়। এতে সাধারণ নেতা-কর্মীদের মাঝে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। আমাদের দেশে বেশির ভাগ ইসলামি দলে অধস্তন কেউ উর্ধ্বতন কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলে দেখা যায় অভিযোগকারীকে শেষ পর্যন্ত সিস্টেমের মধ্যে পড়ে নাজেহাল হতে হয়। ইসলামের সাইনবোর্ড লাগিয়ে এবং দলের সিস্টেমের দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে অনেক নেতার মধ্যে অপরাধপ্রবণতা দেখা যায়।

অনুযোগ-অভিযোগ থেকে মুক্ত থাকার মতো চরিত্র থাকলেই ইসলামি আন্দোলনের সফলতা হয়ে যায় না। এর বাইরে উন্নত নৈতিক চরিত্রের উপস্থিতি প্রয়োজন। হজরত মুহাম্মদ (সা.) অমুসলিম মেহমানকে মসজিদে থাকতে দিয়েছেন, খেতে দিয়েছেন। এটা হচ্ছে নবির সুন্নত, আখলাক বা উন্নত নৈতিক চরিত্রের উদাহরণ। এমন উদাহরণ বর্তমান সময়ে কল্পনা করা একটু কঠিন হয়ে গেছে। ইসলাম বিজয় লাভ করেছে তলোয়ারে নয়; উদারতায়, উন্নত নৈতিক চরিত্রের উপস্থাপনায়। ইসলামের সোনালি যুগে আখলাক দেখে অমুসলিমরা দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করেছিল। উন্নত চরিত্র সাধনের কথা কুরআন ও হাদিসের বিভিন্ন জায়গায় বলা হয়েছে। সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ কুরআনে সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ দেওয়ার কথা বলেছেন। সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ সাধারণত ইসলামি রাজনীতির একটি কর্মসূচি হয়ে থাকে। সৎ কাজের আদেশ দিতে যেমন উন্নত নৈতিক চরিত্র লাগবে, তেমনি অসৎ কাজে নিষেধ দিতে গেলেও নিজেকে আগে অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকা লাগবে। এ কাজ করতে গেলে কিছু গুণাবলির অধিকারী হওয়া লাগবে। চরিত্রে আলাদা কিছু বৈশিষ্ট্য থাকা লাগবে। যেগুলোকে উত্তম নৈতিক চরিত্রও বলা যায়।

২০০১ সালের নির্বাচনে বাংলাদেশের ইসলামপন্থীদের অনেকেই এমপি হন। সরকারেও ছিলেন কেউ কেউ। অনেক এমপি নিজেরা সৎ ও দুর্নীতিমুক্ত থাকার উদাহরণ সৃষ্টি করতে পারলেও কেউ কেউ পারেননি। অনেক জায়গায় ইসলামি দলের কিছু কিছু লোক এমপির দলের লোক হওয়ায় প্রশাসনে ও সাধারণ জনগণের মাঝে অবৈধ পন্থায় প্রভাবও খাটিয়েছেন। থানা পুলিশের দালালিও করেছেন অনেকে। সাধারণ লোকজন তখন ভাবে, তাহলে প্রচলিত দলের নেতা-কর্মী আর এই ইসলামি দলের নেতার মধ্যে পার্থক্য কী।

অনেকে ভিন্ন পরিবেশে ভিন্ন শিক্ষার মাধ্যমে এবং ভিন্ন সংস্কৃতির সাথে পরিচিত হয়ে বেড়ে উঠার কারণে অনেক সময় তারা ইসলামের অনেক উদারতার কথাই জানে না। ইসলামি দলের নেতা-কর্মীদের আচার-আচরণ এবং অন্য ইসলামপন্থীদের চরিত্র দেখে তারা এটাকে ইসলাম মনে করে। অনেক ইসলামপন্থীর মাঝে উদারতার বিষয়টি অনুপস্থিত থাকায় অনেকে ইসলাম সম্পর্কে, ইসলামি আন্দোলন সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে থাকে। ইসলামের সোনালি যুগের আখলাক ও উদারতার বহু ঘটনার উদাহরণ রয়েছে। এসব উন্নত নৈতিক চরিত্র ও উদারতার ঘটনা ইসলামি আন্দোলনের প্রতি মানুষের আকর্ষণ আরও বাড়িয়েছে। ঈমানের ফল হচ্ছে আখলাক বা নৈতিক চরিত্র। একজন মুসলমান যখন সকল কাজে আখলাক নিয়ে উঠবে, তখন ইসলাম প্রচার-প্রসার লাভ করবে।

ব্যবসা-বাণিজ্য ও আয়-রোজগারে অধিক ঝোঁক

একটি আন্দোলনকে বিজয়ী করার জন্য এক দল নিঃস্বার্থ ও দুনিয়াবিমুখ মানুষের প্রয়োজন। জীবন-ধারণের প্রয়োজনীয় উপকরণ, ধন-সম্পদ অর্জন কিংবা বৈধ উপায়ে অনেক বেশি সম্পদ অর্জন দোষের কিছু নয়। কিন্তু কোনো আন্দোলনের জনশক্তির বড়ো একটি অংশটির ঝোঁক যদি থাকে ব্যবসা-বাণিজ্যে কিংবা আয়-রোজগারের অন্য কোনো মাধ্যমের প্রতি হয়, সে আন্দোলনের জনশক্তির মাধ্যমে এমন একটি আন্দোলনের সফলতা সুদূরপর্যন্ত হবেই। আর ধন-সম্পদের প্রতি অতিরিক্ত মোহ একটা সময়ে সঠিকপথের লোককেও বিভ্রান্ত করে ফেলে। বৈষয়িক স্বাদ-আস্বাদনের লোভ-লালসাই প্রকৃতপক্ষে অনৈতিকতা চরিত্রহীনতা ও দুর্নীতি সৃষ্টির মূল কারণ।^{৯৪}

বাংলাদেশের ইসলামপন্থী তরুণ অংশটির মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য ও আয়-রোজগারের অধিক ঝোঁক পরিলক্ষিত হয় ছাত্রজীবন থেকে। অনেকেই দেখা যায় ছাত্রজীবনে আয়-রোজগারে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। আবার অনেকে ছাত্রজীবন শেষ করার প্রাক্কালেই ব্যবসা-বাণিজ্য, আয়-রোজগারের পথ সুগম করতে রাখেন। যারা ছাত্রজীবনের আয়-রোজগারে ব্যস্ত হয়ে পড়েন, তাদের অনেককেই দেখা যায় সাম্প্রতিক সময়ে এমএলএম (মাল্টি লেবেল মার্কেটিং) ব্যবসায় জড়িয়ে পড়েন। বিভিন্ন এমএলএম কোম্পানির সাথে এ দেশের ইসলামি রাজনৈতিক দলগুলোর তরুণদের একটি বড়ো অংশ জড়িয়ে পড়ে। এই এমএলএম ব্যবসার কারণে তাদের মধ্যে বৈষয়িক স্বাদ-আস্বাদনের বিষয়টি কাজ করে। অন্যদিকে লোকসানের ফলে লেনদেনে একে অন্যের মধ্যে তিক্ততা সৃষ্টি হয়। সমাজের লোকজন তখন বাঁকা চোখে দেখে এসব এমএলএম ব্যবসায় সম্পৃক্ত তরুণদের। ছাত্রজীবনে এসব তরুণেরা আরও বিভিন্ন ধরনের আয়-রোজগারে জড়িত হয় কিংবা জড়িত হওয়ার পথ খোঁজে। বিভিন্ন কোম্পানি ও ব্যবসায়িক গ্রুপে পুঁজি বিনিয়োগ করে কিংবা সঞ্চয় করে। নিজেরাও গড়ে তোলে ব্যবসায়িক গ্রুপ।

^{৯৪}. মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *খিলাফতে রাশেদা*, (ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ৯ম প্রকাশ, ২০০৯), পৃষ্ঠা, ১২৫

আল্লাহর সম্ভ্রুতি অর্জনের জন্য যে আন্দোলনে যুক্ত হয় এসব ছাত্র-তরুণ, সেই আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত জনগোষ্ঠীর মধ্যে তারা এসব স্বার্থসংশ্লিষ্ট, আয়-রোজগারের বিষয়কে কাজে লাগায়। সোজা কথায়, সংগঠনে ব্যয়িত সময়ের মধ্যে অনেকে তাদের কার্যক্রম চালায়। এতে সাধারণ জনগণ, এমনকী এসব দলের নিঃস্বার্থ জনগোষ্ঠীর কাছে ভুল বার্তা যায়। আর এসব ছাত্র-তরুণদের ক্যারিয়ারও ধ্বংস হয়। মেধা চলে যায় ব্যবসা-বাণিজ্যে, টাকা-পয়সার দিকে।

অন্যদিকে বলছিলাম ছাত্রজীবন শেষ হওয়ার প্রাক্কালে ব্যবসা-বাণিজ্য ও আয়-রোজগারের ধাক্কা খোঁজে অনেকে। ছাত্রজীবন শেষ করার পর পরই কয়েকজন মিলে একটু বড়ো অংশের পুঁজি নিয়ে ব্যবসা শুরু করে। সেই ব্যবসা আবার সৃজনশীল না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় রিয়েল স্টেট ব্যবসা, হাসপাতাল ব্যবসা, এমনকী শিক্ষা বাণিজ্যেও জড়ায় বাংলাদেশের বিভিন্ন ইসলামি রাজনৈতিক দলের ছাত্রসংগঠনের নেতারা। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান সৃজনশীল খাত হলেও ইসলামপন্থীরা যে এ দেশে খুব ভালো মানের বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান করেছে— তা কিন্তু নয়। আবার যেগুলোতে অন্যদের সাথে তাল মিলিয়ে ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে একটু মান দিয়েছে সেগুলোতে শিক্ষা ব্যয় কিন্তু কম নয়। তুরস্কের ফেতুল্লাহ গুলেন যেরকম হোপ স্কুল করেছেন, বাংলাদেশের ইসলামপন্থীদের মধ্যে এমনটি লক্ষ করা যায় না।

ব্যবসা-বাণিজ্য খারাপ কিছু নয়। আদর্শিক আন্দোলনের লোকজনের চিন্তা-চেতনায় যদি ব্যবসা থাকে, থাকে আয়-রোজগারের বিষয় তাহলে সে আন্দোলন বিজয়ী হবে কীভাবে। বৈষয়িক স্বার্থের এই ক্ষতিকর দিক উপলব্ধি করে হজরত উমর (রা.) এটাকে ঘৃণা করতেন। তাঁর সমসাময়িক লোকেরা একবাক্যে স্বীকার করতেন যে, ভোগ-বিলাসে অনীহা ও অল্প তুষ্টির ক্ষেত্রে তিনি সকলকে দাড়িয়ে গেছেন।^{৯৫} শুধু ইসলামি আন্দোলনের ক্ষেত্রে নয়; অন্য যেকোনো রাজনীতি কিংবা আন্দোলনের ক্ষেত্রেও এটা। আন্দোলনের মূল সারির নেতারা যদি বৈষয়িক স্বার্থকে অতিরিক্ত প্রাধান্য দেন তাহলে সমস্যা। মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী একজন বড়ো মাপের নেতা ছিলেন। সফল নেতা ছিলেন। তাঁর ডাকে দেশের জনগণ সাড়া দিত। কিন্তু তিনি খুবই সাধারণ জীবন পরিচালনা করেছেন। ঢাকা শহরের বাড়ি-গাড়ি তো ছিলই না। টাঙ্গাইলে থাকতেন কুড়ে ঘরের মতো আবাসে। খাবার-দাবার পোশাক পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অতি সাধারণ।^{৯৬}

ইসলামপন্থীদের ক্যারিয়ার শুধু ব্যবসা-বাণিজ্যকেন্দ্রিক হবে কেন। আরও বহু সেক্টর রয়েছে। প্রশাসন, আইন-আদালত, শিক্ষকতা, সাংবাদিকতাসহ অনেক সেক্টর। এরকম যদি ১০টি সেক্টর চিহ্নিত করা হয় তাহলে প্রতি সেক্টরের গড়ে ১০% করে যাওয়ার কথা। কিন্তু দেখা যায় দেশের বড়ো বড়ো ইসলামি দলগুলোর তরুণ অংশ অর্থাৎ ছাত্র সংগঠনের জেলা-উপজেলা পর্যায়ের নেতারা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে ঝুঁকে। জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম,

^{৯৫}. মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *খিলাফতে রাশেদা*, (ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ৯ম প্রকাশ, ২০০৯), পৃষ্ঠা, ১২৫

^{৯৬}. মহিউদ্দিন আহমদ, *আওয়ামী লীগ : উত্থান পর্ব ১৯৪৮-১৯৭০*, ঢাকা : প্রথমা প্রকাশন, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০১৭

খেলাফত মজলিস, খেলাফত আন্দোলন-এর নেতা-কর্মীর মাদ্রাসার শিক্ষকতা ও মসজিদের ইমামতির দিকে ঝুঁকে। অন্যান্য সেঙ্করে যাওয়ার ক্ষেত্রে ইসলামপন্থীদের ঝোঁক কম। ব্যবসা-বাণিজ্য, আয়-রোজগারের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ তাদের।

লোভ ও স্বার্থপরতা

আদর্শিক আন্দোলনে স্বার্থপরতা ঢুকে পড়লে সফলতা সুদূরপর্যন্ত হয়ে যায়। সমাজতান্ত্রিক আদর্শের ক্ষেত্রেও এমনটি। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হয় পৃথিবীতে মহাসমারোহে। টিকেনি বেশি দিন। কমিউনিস্টদের আদর্শচ্যুতি ঘটেছিল। স্বার্থপরতা ঘিরে ফেলেছিল। বাংলাদেশের ইসলামি রাজনৈতিক দলগুলোর অনেক নেতা-কর্মী আছে, যারা হয়তো নিঃস্বার্থ মন নিয়ে আন্দোলনে সম্পৃক্ত হয়। কিন্তু একটা অংশ সক্রিয় হন ও সক্রিয় থাকেন স্বার্থপরতার জন্য। এই স্বার্থপরতা নানাবিধ। ইসলামপন্থীদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আছে। সেসব প্রতিষ্ঠান চাকরি করার ভেতরে ভেতরে মানসিকতা লালন— এ একটা স্বার্থপরতা।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ‘ক’ একটি বড়ো ইসলামি দলের ছাত্র সংগঠনের উপজেলা সভাপতি। ওই উপজেলা সংগঠনের একটি মটরসাইকেল আছে এবং সভাপতির কাছেই থাকে। ‘ক’ সভাপতি হিসেবে এই মটরসাইকেলটি নিয়মিত ব্যবহার করেন। সাংগঠনিক কাজের বাইরেও তিনি তার ব্যক্তিগত ও পারিবারিক কাজেও এটা ব্যবহার করেন। কিন্তু এটার তেল খরচ নেন সংগঠনের ফান্ড থেকে। ‘ক’-এর পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো নয়। এসএসসি পাশ করার পর বাবার কাছে একটি বাইসাইকেল চেয়েও পাননি। কারণ, বাবার সে সামর্থ্য ছিল না। ফলে ‘ক’-কে অনেক দূরের পথ হেঁটে যেতে হতো। সেই ‘ক’ এখন তার আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে বেড়ানো, নিজের পারিবারিক কাজে সংগঠনের মটরসাইকেল ব্যবহার করছেন সংগঠনের ফান্ডের অপব্যবহার করে। শুধু তাই নয়; ‘ক’ এ মটরসাইকেল ব্যবহার করে বিভিন্ন কর্মীর বাড়িতে গিয়ে কাজ করে একটা ব্যবসায়িক গ্রুপও গড়ে তোলেন।

একটি ইসলামি ছাত্র সংগঠনের উপজেলা সভাপতি হিসেবে অনেকে তাকে বিশ্বাস করেন। সেই বিশ্বাসকে কাজে লাগিয়ে ৫০ জনের কাছ থেকে জনপ্রতি এক লাখ টাকা করে নিয়ে তিনি ৫০ লাখ টাকার ব্যবসা শুরু করেন। নিজের পুঁজি না থাকলেও ৫০ লাখ টাকা দিয়ে এখন ব্যবসা করছেন। এ ধরনের উদাহরণ কোনো কোনো ইসলামি রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মী এবং তাদের ছাত্র সংগঠনের নেতা-কর্মীর মাঝে দৃশ্যমান। উন্নত নৈতিক চরিত্রের ঘাটতি এবং কথা ও কাজে অমিল দেখে দলের অনেক নিবেদিতপ্রাণ কর্মী আস্তে আস্তে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েন। অন্যদিকে, এখন এসব বিষয় অনেক সাধারণ মানুষের চোখেও ধরা পড়ছে। ফলে সাধারণ মানুষ নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখছে এসব নেতা-কর্মী এবং ইসলামি দলকে।

তুরস্কসহ যেখানে ইসলামপন্থীরা ভালো করেছেন, দেখা যাবে তারা লোভ-স্বার্থপরতা থেকে দূরে ছিলেন। একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, যুদ্ধের সময় সাইদ নুরসি The Six Steps শিরোনামে একটি প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। এই লেখায় তুর্কি সৈনিকদের মনোবল চাঙা হয়। স্বীকৃতিস্বরূপ কামাল আতাতুর্ক তাকে আঙ্কারায় আমন্ত্রণ জানান ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

কিন্তু নুরসির ধর্মীয় প্রভাবে নয়। তুর্কি প্রজাতন্ত্রে কামালবাদী সেক্যুলার আদর্শ বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছিল। এ কারণে কামাল আতাতুর্ক সাইদ নুরসিকে ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালনের প্রস্তাব দেন। যাতে করে সাইদ নুরসিকে সরকারি নিয়ন্ত্রণে আনা যায়। কিন্তু আদর্শের প্রতি দৃঢ় ও প্রজ্ঞাবান নুরসি এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।^{৯৭} মূলত তখন থেকেই কামালবাদী আদর্শের সঙ্গে সাইদ নুরসির আদর্শিক সংঘাত শুরু হয়।^{৯৮} সরকার সর্বক্ষেত্রে ইসলাম ও কুরআনকে নিষিদ্ধ করার প্রেক্ষিতে তিনি ঘোষণা করেন, ‘আমি পৃথিবীর কাছে প্রমাণ করব কুরআন নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার মতো কিছু নয়। এটা হলো এক শ্বাশত জীবনব্যবস্থা। এক অফুরান আলোর উৎস।’ সাইদ নুরসি অবশ্য তারপর থেকে নিজেকে রাজনীতি থেকে গুটিয়ে নিতে শুরু করেন।

বক্তব্য সঠিকভাবে উপস্থাপনে ব্যর্থতা

ইসলামি রাজনৈতিক দলগুলোর বক্তব্য জনগণের কাছে স্পষ্ট নয়। বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর বড়ো অংশটি মুসলিম হলেও তাদের বড়ো অংশটি ইসলামি শরিয়া আইন বিষয়ে ভালোভাবে অবগত নয়। ফলে সহজে অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ইসলামি সমাজ প্রতিষ্ঠার কথা বলা হলে মনে করা হয় উক্ত সমাজের মূল কাজ হচ্ছে চোরের হাত কাটা। চুরির শাস্তি হাত কাটার কথা শুনে অনেকে আঁতকে উঠেন। যারা অপরাধপ্রবণ; তারা ভয় পায়-ই। অন্যদিকে, যারা মানবতাবাদী, মানবাধিকারের কথা বলে; তারাও হাত কাটার মতো বিষয়টি মেনে নিতে পারে না। অথচ বিষয়টি আসলে এরকম নয়। এ বিষয়ে বেশির ভাগ মানুষের কাছে ইসলামের বার্তা স্পষ্ট নয়। ইসলামি সমাজব্যবস্থার মূল টার্গেট চোরের হাত কাটা নয়। মূল টার্গেট দরিদ্রতা বিমোচন করা এবং অপরাধমুক্ত সমাজ উপহার দেওয়া। এমন সমাজ কে না চায়। সে বার্তাটি ইসলামপন্থীরা মানুষের কাছে পৌঁছিয়ে দিতে পারছে না। অন্যকথায়, অনেক ইসলামপন্থীর কাছেও আসল বার্তা স্পষ্ট নয়।

দরিদ্রতা বিমোচনের জন্য ইসলামের জাকাত ব্যবস্থা রয়েছে। সুশাসন এবং আইনের শাসনের বিষয়টি রয়েছে। জাকাত ব্যবস্থা সঠিকভাবে কার্যকর হলে, সুশাসন প্রতিষ্ঠা হলে দরিদ্রতা কমে আসবে কিংবা সমাজে দরিদ্রতা না-ও থাকতে পারে। ইসলামের বার্তা হচ্ছে, দরিদ্রতা বিমোচন

^{৯৭}. মাসুদ মজুমদার, সাইদ নুরসি : তুরস্ক পালটে যাওয়ার নায়ক, দৈনি নয়াদিগন্ত, ১৪ ডিসেম্বর ২০১৬

^{৯৮}. আবদুল ইসলাম চৌধুরী, আধুনিক তুরস্কে ইসলামের পুনরুজ্জীবনকারী সাইদ নুরসিপ্রবন্ধ, সিএসসিএস, মার্চ ১৭, ২০১৫ (<https://cscsbd.com/1010>)

করার পর কেউ অভাবের পরিবর্তে স্বভাবের কারণে যদি চুরি করলে তাহলে ইসলামি দণ্ডবিধি প্রযোজ্য হবে। মূলত ইসলাম এমন একটি সমাজ উপহার দিতে চায় যেখানে একদিকে অভাব থাকবে না, অপরদিকে মানুষের মনে অপরাধপ্রবণতা লোপ পাবে। কেউ কারও প্রতি জুলুম করবে না; রাষ্ট্রব্যবস্থার মূল দায়িত্ব থাকবে সমাজে ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা। অথচ বর্তমানে ইসলামি সমাজের কথা উঠলেই শুধু ইসলামি দণ্ডবিধিকে মুখ্য করা হয়। শুধু জনগণ এবং অন্যরা নয়; ইসলামের রাজনৈতিক দিক নিয়ে চরম কুধারণা আছে স্বয়ং অনেক ইসলামি সংগঠনের কর্মীর মধ্যে। চুরি করলে শুধু হাত কাটা নয়; ইসলামি শরিয়া প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সাধারণ মানুষের এবং প্রচলিত ইসলামি দলের অনেক কর্মীর আরও কিছু কুধারণা হলো—

- ক. ইসলামি সরকার ক্ষমতা নেওয়ার পর সকল গার্লস স্কুল, মহিলা কলেজ বন্ধ করে দেওয়া হবে। মেয়েদের লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যাবে। কালো বোরকা পরে রাস্তায় বের হতে হবে। মহিলাদের ঘর থেকে বের হওয়াটাই বন্ধ করে দেবে ইত্যাদি ইত্যাদি।
- খ. সকল সিনেমা হল একযোগে বন্ধ করে দেওয়া হবে। গান, নাটক, সিনেমার সকল বই সিডি ক্যাসেট খুঁজে খুঁজে ধ্বংস করে ফেলা হবে। বিনোদন বলতে কিছু থাকবে না।
- গ. দেশে হিন্দু, বৌদ্ধ ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজনকে ধরে ধরে কচুকাটা করা হবে। কিংবা তাদের দ্বিতীয়, তৃতীয়শ্রেণির নাগরিক হিসেবে থাকতে হবে।
- ঘ. ছেলেমেয়ে একসাথে চলতে দেখলেই ধরে দোররা মারা হবে। ব্যাভিচার বা ধর্ষণের অভিযোগ উঠলেই ধরে এনে পুতে ফেলা হবে। পাথর মেরে সঙ্গেসারে^{৯৯} করে দেওয়া হবে।

ইসলামি সমাজব্যবস্থা বলতে শুধুই ইসলামি দণ্ডবিধি নয়; আরও অনেক কিছু। একটা রাষ্ট্রে যদি দরিদ্রতা না থাকে, সে রাষ্ট্রে যদি আইনের শাসন থাকে, মানুষ শান্তিতে বসবাস করে; এমন একটি রাষ্ট্রে কোনো নাগরিক তো চুরি করা কথা না। এরপরও যদি কেউ চুরির মতো নিন্দনীয় অপরাধ করে ফেলে, তাহলে তার শাস্তি হাত কাটা কি খুব বেশি কিছু? ইসলামের স্বর্ণযুগে দেখা গেছে,

একটি ইসলামি রাষ্ট্রের একজন সুন্দরী রমণী বহু দূরের পথ পাড়ি দিয়েছে মূল্যবান অলংকারাদি সাথে নিয়ে; তার মধ্যে চুরি-ডাকাতির ভয়ও ছিল না, সম্ভ্রমহানির ভয়ও ছিল না। ইসলাম এমন একটি সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কথা বলে। তারপরেই আসে ইসলামি দণ্ডবিধি কার্যকরের বিষয়টি।

ইসলামি দলগুলো ইসলাম কায়েমের কথা বলে। ইসলাম কায়েম হলে জনগণ বাস্তব জীবনে কীভাবে উপকৃত হবে তা তারা ঠিকমতো উপস্থাপন করতে পারেনি। এটা জনগণের সামনে উপস্থাপন করে জনগণকে বোঝানোর মতো বাস্তবসম্মত কর্মসূচিও দেখা যায় না। মানুষকে অবশ্যই লাভ দেখাতে হবে। এটা আল্লাহরও হুকুমাত। কুরআনে যেখানেই কোনো নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সেখানেই তার পুরস্কার হিসেবে জান্নাতের কথা বলা হয়েছে।

^{৯৯}. সঙ্গেসারে হচ্ছে ধর্ষককে বা ব্যাভিচারী পুরুষ/নারীকে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা। সঙ্গেসারের নিয়ম অনুযায়ী ধর্ষণকারীকে কোমর পর্যন্ত মাটিকে গেড়ে রেখে জুম্মার নামাজের পর সব মুসল্লির সামনে তাকে পাথর নিক্ষেপ করে মেরে ফেলা।

জান্নাতের মনোরম বর্ণনাও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ইসলামি দলগুলো জনগণকে বাস্তব লাভ দিতেও ব্যর্থ। লাভের স্বপ্ন দেখাতেও ব্যর্থ। সেদিক থেকে অন্যান্য দলের নেতারা দুটোই করতে সক্ষম হয়। তারা নির্বাচনের আগে মানুষকে অনেক উজ্জ্বল ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখায়। ব্রিজ-কালভার্টের টাকা লুটেপুটে খেলেও নির্বাচনের আগে হাতে হাতে নগদ টাকা ধরিয়ে দেয়। প্রচুর চা, বিড়ি-সিগারেট খাওয়ানো হয়। কর্মীদের বিরিয়ানি খাওয়ানো হয়। ফলে ভোট তাদের মার্কাতেই পড়ে। ইসলামি দলগুলো ভোটের আগে টাকা দিতে গেলেও বিপদ। কারণ, জনগণ এটাকে ইসলামি দলের আদর্শচ্যুতি মনে করে।

ইসলাম কোনো সমাজে জোরপূর্বক প্রতিষ্ঠিত হয়নি। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অনেক দেশেও এই ধরনের সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কিন্তু মুসলিম সংখ্যালঘিষ্ঠ কিছু দেশের নাগরিকরা ইসলামের সামাজিক ন্যায়-নীতি ও ইনসাফের দৃষ্টান্ত দেখে আল্লাহর আইনের ভিত্তিতে সমাজ পরিচালনাকে যখন স্বাগত জানিয়েছে তখন উক্ত দেশসমূহে ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। স্পেন ও ভারতবর্ষে দীর্ঘদিন ধরে মুসলিম শাসন ছিল। অথচ এই উভয় দেশেই মুসলমানেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল না। এই তথ্য এই বাস্তবতারই সাক্ষ্য বহন করে যে, একটি দেশের অধিকাংশ জনগণ চাইলেই আল্লাহর আইনের ভিত্তিতে সমাজ পরিচালিত হতে পারে; জনগণ না চাইলে জোরপূর্বক ইসলাম প্রতিষ্ঠার কোনো নজির নেই। আল্লাহর আইনের ভিত্তিতে সমাজ পরিচালিত হওয়ার জন্য উক্ত দেশের অধিকাংশ নাগরিক সেই ধর্মবিশ্বাসী হওয়া জরুরি নয়। আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মূল কথাই হচ্ছে জনগণের মতামতের ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালিত হওয়া। বর্তমানে নির্বাচনের মাধ্যমেই জনগণের মতামত প্রতিফলিত হয়। ইসলামে স্বৈরতান্ত্রিকতার কোনো স্থান নেই। অতএব, একটি দেশ কোন আদর্শের ভিত্তিতে পরিচালিত হবে তা নির্ধারণের দায়িত্ব উক্ত দেশের জনগণের। সেই জনগণকে ইসলামি রাজনৈতিক দলগুলো কাছে টানতে পারছে না। জনগণের কাছে ইসলামের সুমহান বক্তব্য উপস্থাপন করতে পারছে না।

ইসলামে যে একটি রাষ্ট্রনীতি আছে, সেটাই অজানা বেশির ভাগ মানুষের। ইসলামপূর্ব সময়ে মদিনা পরিচিত ছিল ইয়াসরিব হিসেবে। মোহাম্মদ (সা) সেখানে হিজরত করার পর নাম পালটে রাখা হয় মদিনা। এই পরিবর্তন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মদিনা অর্থ শহর বা নগর। এই নামের মধ্যেই নিহিত রয়েছে যে, ইসলাম নিছক কোনো ধর্ম নয়; বরং এটি একটা সভ্যতা সংক্রান্ত ব্যাপার। ইসলাম মানুষকে যাযাবর জীবন থেকে নাগরিক জীবনে নিয়ে এসেছে। ইসলাম যেখানেই গেছে সেখানেই নগরের পত্তন হয়েছে।^{১০০} ইসলামি দলগুলো ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা বলে।

^{১০০}. রশিদ ঘানুশী

তারা কল্যাণরাষ্ট্রের কথা বলে না। কল্যাণরাষ্ট্র^{১০১} গঠনের কোনো পরিকল্পনাও তাদের নেই। ইসলামি রাষ্ট্রের ধারণার সাথে কল্যাণরাষ্ট্রের বিষয়টি আছে। কিন্তু সেটাও তারা স্পষ্ট করতে পারেনি।

কোনো ইসলামি দল ক্ষমতায় গেলে দেশের শাসনতন্ত্র কী হবে; নারীদের ব্যাপারে তাদের অবস্থান কী; অর্থনৈতিক রূপরেখা কেমন হবে; অমুসলিমদের সঙ্গে কী ধরনের আচরণ করা হবে এর সুস্পষ্ট কোনো ধারণা ইসলামি দলগুলো জনগণকে দিতে পারেনি। যেকোনো সমস্যার সর্বোৎকৃষ্ট সমাধান যে ইসলামে রয়েছে সেটা সাধারণ মানুষকে জানাতে ব্যর্থ হয়েছে। এজন্য নির্বাচনগুলোতে ইসলামি দলের প্রার্থীরা ভালো করতে পারে না। কিছু ব্যতিক্রম বাদে ইসলামি দলের হয়ে এককভাবে নির্বাচন করলে বেশির ভাগ প্রার্থী জামানত হারান। অথচ এ দেশে ইসলামপ্রিয় মানুষের সংখ্যা অনেক বেশি।

নতুন প্রজন্মের চিন্তা-চেতনা ও আশা-আকাঙ্ক্ষা বর্তমান সময়ে অনেকটা মিডিয়া প্রারণার দ্বারা প্রভাবিত। গতানুগতিক ধারায় ইসলামি আদর্শের প্রতি আহ্বান জানানোর কৌশল এখন আর খুব একটা কার্যকর হচ্ছে না। মিডিয়ার মাধ্যমে এখন যদি কেউ তার বক্তব্য উপস্থাপন না করে তাহলে সেটা একটা ব্যর্থতা। নতুন প্রজন্মের চিন্তা-চেতনার আলোকে ইসলামপন্থীরা নিজেদের মিডিয়া উপস্থাপনে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। মিডিয়ায় বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য প্রয়োজন আধুনিক পরিভাষার ব্যবহার ও উপস্থাপনার নতুন আঙ্গিক। বিষয়টি অনুধাবনে ইসলামপন্থীরা অনেক পিছিয়ে।

ইসলামি দণ্ডবিধি ব্যাপারে জনগণ এবং ইসলামি দলের একটা অংশের কর্মীদের মধ্যে যেসব কু-ধারণা বিরাজমান, তাদের থেকে এসব কু-ধারণা দূর করতে হলে শুধু দলীয় দাওয়াত নয়; ব্যাপকভিত্তিক এবং বৃহৎ পরিসরে জ্ঞানের প্রসারের ব্যবস্থা করা যে প্রয়োজন— সে বোধও নেই অনেক ইসলামি দলের মধ্যে।

বৈশ্বিক প্রতিকূল অবস্থা

মুসলিম উম্মাহর বর্তমান পরিস্থিতি এমন যে, তাকে ভেতর ও বাইরের অনেক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হয়। আজ ইসলামি সভ্যতা এবং এর সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত অন্যান্য বিষয় ক্ষয়িষ্ণুতার সম্মুখীন। যার ফলে বহু ব্যাধি ও সমস্যা দেখা দিয়েছে। বাংলাদেশের ইসলামপন্থীরাও বৈশ্বিক এই প্রতিকূলতার শিকার। তাদের নানাবিধ বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হচ্ছে। ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থাবিরোধী শক্তিসমূহ ইসলামি রাজনীতির অগ্রযাত্রাকে প্রতিহত করার জন্য

^{১০১}. কল্যাণরাষ্ট্র : যে রাষ্ট্র আইন ও প্রশাসনের মাধ্যমে অভাবগ্রস্ত অর্থাৎ রুগ্ন, দরিদ্র, বার্ষিক্য পীড়িত, পঙ্গু, দুস্থ প্রভৃতি ধরনের নাগরিকদের জীবনে প্রয়োজনীয় নানাবিধ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করে। ১৯৪২ সালে ব্রিটেনের শ্রমমন্ত্রী লর্ড উইলিয়াম হেনরি বিভারিজের সামাজিক নিরাপত্তা ও পরিসেবাসংক্রান্ত এক রিপোর্টে কল্যাণ রাষ্ট্রের প্রসঙ্গ প্রথম দেখা যায়। কিন্তু কল্যাণরাষ্ট্রের বিষয়টি আগ থেকেই ইসলামে রয়েছে। যদিও পরিভাষা এমনটি ছিল না।

বিভিন্নভাবে কাজ করছে।^{১০২} প্রতিবেশী ভারতসহ বিভিন্ন দেশ ইসলামপন্থীদের বিরোধিতা করে তাদেরকে মৌলবাদী হিসেবে চিহ্নিত করে। মৌলবাদীদের উত্থান ঠেকানোর নামে বাহিরের শক্তির বিরোধিতার মুখে বাংলাদেশের ইসলামি রাজনৈতিক দলগুলো। বেশির ভাগ ইসলামি সংগঠনের বৈশ্বিক এ প্রতিকূল অবস্থা মোকাবিলার কৌশলও জানা নেই এবং জানার চেষ্টাও নেই। ফলে ভেতর ও বাইরের নানাবিধ চাপ কুলিয়ে উঠতে পারছে না।

বর্তমান পৃথিবীতে ইসলাম ও মুসলিমদের সবচেয়ে বড়ো শত্রু হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী অমুসলিম রাষ্ট্রসমূহ। এরাই সংঘবদ্ধ হয়ে মুসলিমদেরকে বিভক্ত করা, তাদের ভূমিতে নিজেদের দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করা এবং পৃথিবীতে ইসলামের নেতৃত্ব মাথা তুলে না দাঁড়াতে দেওয়ার জন্য ১৯২৪ সালে খিলাফত ব্যবস্থার পতন ঘটিয়েছে। এদেরই পূর্বপুরুষরা শতকের পর শতক ইসলাম ও মুসলিমদের নিশ্চিহ্ন করার জন্য ক্রুসেড পরিচালনা করেছে। ইসলামের আবির্ভাবকালে ইসলামবিরোধী যে শক্তিগুলো ছিল, যথা মক্কার কাফির নেতৃত্ব এবং তৎকালীন পরাশক্তি রোম ও পারস্য বর্তমান যুগে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রসমূহ হচ্ছে তাদেরই আরও সংঘবদ্ধ প্রতিরূপ।

এই সাম্রাজ্যবাদীরা ব্যাপক প্রচারাভিযান চালিয়ে যাচ্ছে শুধু পুঁজিবাদকেই মুসলিম ভূমিসমূহের ওপর চাপিয়ে দিতে। সাম্রাজ্যবাদীরা এই ভেবে আতঙ্কিত যে, বিশ্বের নেতৃত্বে মুসলিমরা হয়তো আবারও ফিরে আসবে। এ কারণে আমেরিকাসহ বাকী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো মুসলিম উম্মাহকে সুস্পষ্ট লক্ষ্য বানিয়েছে। তারা মুসলিম বিশ্বের বিরুদ্ধে ছায়াযুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। চরমপন্থা, সম্মানবাদ ও জঙ্গিবাদে পৃষ্ঠপোষকতা ছায়াযুদ্ধের একটি মোক্ষম অস্ত্র। বিভিন্ন দেশে বিদ্রোহী বাহিনীর হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে ছায়াযুদ্ধে অংশগ্রহণ করছে যুক্তরাষ্ট্র। তারা এর চর্চা করেছে সোভিয়েত-আফগান যুদ্ধের সময়। আফগানিস্তানের মুজাহিদ বাহিনীকে অস্ত্র এবং বিভিন্ন সামগ্রী সরবরাহ করে প্রকারান্তে তার ছায়াযুদ্ধে অংশ নেয়।^{১০৩} যুক্তরাষ্ট্রসহ সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলো নিজেরা সরাসরি অথবা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক জোট, অর্থনৈতিক ও সামরিক সংস্থাকে ব্যবহার করে সম্ভাব্য সকল উপায়ে পৃথিবীতে মুসলিমদের ক্রমাগত শক্তিহীন করার চেষ্টা করছে। তাদের এ সকল কাজে সাহায্য করে যাচ্ছে বর্তমান মুসলিম দেশগুলোর তাদেরই তাঁবেদার শাসকবর্গ। এসব তাঁবেদার শাসকবর্গের হাতে বিভিন্ন দেশে ইসলামি রাজনৈতিক দলগুলো কোণঠাসা।

বর্তমানে সারা বিশ্বেই চলছে ইসলামফোবিয়া। পরিকল্পিতভাবে ইসলাম থেকে জনমনে ভয় ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বাংলাদেশও এর বাইরে নয়। ৯/১১-এর ভয়াবহ ও ধ্বংসাত্মক ঘটনার পর প্রতিক্রিয়া হিসেবে পশ্চিমা পর্যবেক্ষক ও নীতিনির্ধারকদের অনেকের মাঝেই একটি প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে। তা হলো—সকল ধারার ইসলামপন্থাকে তারা একইভাবে বিবেচনা করছে। তাদেরকে উগ্রপন্থী হিসেবে ব্র্যাণ্ডিং করা হচ্ছে এবং শত্রু হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে।

^{১০২}. ড. হাসান মোহাম্মদ, *বাংলাদেশের মাদ্রাসা শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১০

^{১০৩}. The Editors of Encyclopædia Britannica, 'Soviet Invasion of Afghanistan', Encyclopædia Britannica. Web. 23 April 2015. <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/1499983/Soviet-invasion-of-Afghanistan>

গ্রন্থপঞ্জি

১. অলি আহাদ, জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ৭৫, ঢাকা : বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিমিটেড, চতুর্থ সংস্করণ ২০০৪
২. অ্যাথুর্নী মাসকারেনহাস, বাংলাদেশ : রক্তের ঋণ, মোহাম্মদ শাহজাহান অনূদিত, ঢাকা : হাক্কানী পাবলিশার্স, সপ্তম মুদ্রণ ২০১২
৩. মেজর (অব.) এম এ জলিল, অরক্ষিত স্বাধীনতাই পরাধীনতা, ঢাকা : ইতিহাস পরিষদ, ৮ম প্রকাশ ২০০৯
৪. ড. আকবর আলি খান, অবাক বাংলাদেশ : বিচিত্র ছলনাজালে রাজনীতি, ঢাকা : প্রথমা প্রকাশন, ২০১৭
৫. ড. আকবর আলি খান, পরার্থপরতার অর্থনীতি, ঢাকা : দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, চতুর্দশ মুদ্রণ ২০১৬
৬. ড. আকবর আলি খান, বাংলাদেশের সত্তার অন্বেষা, আমিনুল ইসলাম ভূইয়া অনূদিত, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০০৪
৭. শেখ আখতার উল ইসলাম, স্বাধীনতা যুদ্ধের সিপাহসালার বঙ্গবীর জেনারেল ওসমানী, ঢাকা : উৎস প্রকাশন, ২০১০
৮. আ.ন. ইয়াকভলেভ, রাজনীতির মূলকথা, ননী ভৌমিক অনূদিত, মস্কো : প্রগতি প্রকাশন, ১৯৭৫
৯. মো. আবুসালেহ সেকান্দার, বাংলা কোচবিহারের সামরিক ইতিহাস, জনসংযোগ, তথ্য ও প্রকাশনা দপ্তর, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ২০১৯
১০. অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুল বাকী, বাংলাদেশের বিভিন্ন মুসলিম সম্প্রদায়ের ইতিবৃত্ত ও মতাদর্শ, ঢাকা : মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, ২০০৯
১১. আবু সলিম মুহাম্মদ আব্দুল হাই, রাসূলুল্লাহর বিপ্লবী জীবন, মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান অনূদিত, ঢাকা : নাকিব পাবলিকেশন্স, ২০০৭
১২. সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী, ইসলামী রাষ্ট্র ও সংবিধান, আবদুস শহিদ নাসিম ও আকরাম ফারুক অনূদিত, ঢাকা : শতাব্দী প্রকাশনী, তৃতীয় মুদ্রণ ২০১৩
১৩. আবুল মনসুর আহমদ, আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, ঢাকা : খোশরোজ কিতাব মহল, ১৯৮৪
১৪. সাইয়েদ আবুল হাসান আলি নদভী, কাদিয়ানী সম্প্রদায় : তত্ত্ব ও ইতিহাস, জুবাইর আহমদ আশরাফ অনূদিত, ঢাকা : আন্তর্জাতিক মজলিসে তাহাফুফে খতমে নবুওত, ১৯৯৬
১৫. মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, জবানবন্দি, আখতার ফারুক অনূদিত, ঢাকা, ১৯৮১
১৬. মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, ভারত স্বাধীন হলো, সুভাষ মুখোপাধ্যায় অনূদিত, হায়দ্রাবাদ (ভারত) : ওরিয়েন্ট লংম্যান প্রাইভেট লিমিটেড, সপ্তম সংস্করণ ২০০১
১৭. মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, আমাদের জাতিসত্তার বিকাশ ধারা, ঢাকা : কামিয়াব প্রকাশন, ৩য় সংস্করণ ২০০৬
১৮. ড. আবুল ফজল হক, বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি, রংপুর : টাউন স্টোর্স, সপ্তম সংস্করণ ২০০০

১৯. প্রিন্সিপাল আবুল কাসেম, *বিজ্ঞান সমাজ ধর্ম*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ ১৯৮৭
২০. আবুল হাশিম, *আমার জীবন ও বিভাগপূর্ব বাংলাদেশের রাজনীতি*, কলকাতা : চিরায়ত প্রকাশন, ১৯৭৮
২১. আবু জাফর মোস্তফা সাদেক, *বাংলাদেশে কমিউনিস্ট আন্দোলন*, ঢাকা : চলন্তিকা বইঘর, ১৯৮৭
২২. আবুসাদাত মোহাম্মদ সায়েম, *বঙ্গভবনে শেষ দিনগুলি*, ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, চতুর্থ মুদ্রণ ২০১৮
২৩. আবদুল মান্নান তালিব, *ইসলামী জীবন ও চিন্তার পুনরগঠন*, ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৪
২৪. মোহাম্মদ আব্দুল হাই, *লালেং ক্যানভাস*, সিলেট : শ্রীহট্ট প্রকাশন, ২০১৭
২৫. আবদুল হালিম আবু শুককাহ, *রসূলের (সা.) যুগে নারী স্বাধীনতা (২য় খণ্ড)*, মাওলানা মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক ও আবদুল মান্নান তালিব অনূদিত, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থট, ২০০২
২৬. মো. আব্দুল হালিম, *সংবিধান, সাংবিধানিক আইন ও রাজনীতি : বাংলাদেশ প্রসঙ্গ*, ঢাকা : সিসিবি ফাউন্ডেশন, পঞ্চম সংস্করণ ২০০৮
২৭. মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *খিলাফতে রাশেদা*, ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ৯ম প্রকাশ, ২০০৯
২৮. আবদুল রশিদ মতিন, *রাষ্ট্রবিজ্ঞান : ইসলামী প্রেক্ষিতে*, এ কে এম সালেহউদ্দিন অনূদিত, ঢাকা : বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যাট
২৯. সি.এম. আব্দুল ওয়াহেদ, *সিলেটে গণভোট*, প্রকাশক : নাজমুন নাহার, পবিরেবশক: প্রীতি প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৯
৩০. ড. মো. আব্দুল্লাহ আল-মাসুম, *ব্রিটিশ আমলে বাংলার মুসলিম শিক্ষা: সমস্যা ও প্রসার*, বাংলা একাডেমি ঢাকা, ২০০৮
৩১. আব্দুল ওয়াহিদ, *উপমহাদেশের রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতা ও মুসলমান*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৩
৩২. ড. আমীনুল ইসলাম, *ইসলাম ধর্ম ও মুসলিম দর্শন*, ঢাকা : উত্তরণ, ২০০৪
৩৩. ড. আহমদ আব্দুল কাদের, *ইসলামী আন্দোলন ও ওলামা সমাজ*, ঢাকা
৩৪. লে. জে. এ. এ. কে. নিয়াজি, *দ্য বিট্রিয়াল অভ ইস্ট পাকিস্তান*, ডা. মিজানুর রহমান কল্লোল অনূদিত, ঢাকা : আফসার ব্রাদার্স, ২০১৬
৩৫. লে. কর্ণেল (অব.) এম.এ. হামিদ পিএসপি, *তিনটি সেনা অভুত্থান ও কিছু না বলা কথা*, ঢাকা : কালিকলম প্রকাশন, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১২
৩৬. মেজর জেনারেল (অব.) সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম বীরপ্রতীক, *দ্য ব্যাটেলস অব ইসলাম*, ঢাকা : অনন্যা, ২০০৯
৩৭. ইবনে হিশাম, *সীরাতে ইবনে হিশাম*, আকরাম ফারুক অনূদিত, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, অষ্টাদশ প্রকাশ, ২০১২
৩৮. প্রফেসর ড. ইউসুফ আল কারজাভি, *ইসলামী আন্দোলন : আধুনিক যুগ, কৌশল ও পদ্ধতি*, মুহাম্মাদ সানাউল্লাহ আখঞ্জী অনূদিত, ঢাকা : ইসলামিক ইনফরমেশন ব্যুরো বাংলাদেশ, ১৯৯৫

৩৯. প্রফেসর ড. ইউসুফ আল কারজাভি, *দারিদ্র বিমোচন*, মোহাম্মদ মিজানুর রহমান ও মুহাম্মদ সাইফুল্লাহ অনূদিত, ঢাকা : সেন্ট্রাল শরিয়াহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ, ২০০৮
৪০. ইয়াহইয়া আরমাজানী, *মধ্যপ্রাচ্য অতীত ও বর্তমান*, মুহাম্মাদ ইনাম-আল-হক অনূদিত, ঢাকা : জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ২০০০
৪১. ইয়াসির নাদীম, *বিশ্বায়ন : সাম্রাজ্যবাদের নতুন স্ট্র্যাটেজি*, ঢাকা : প্রফেসর'স পাবলিকেশন্স, ২০০৮
৪২. এম.এ. রহিম, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*, ঢাকা : আহমদ পাবলিশিং হাউস, ৫ম মুদ্রণ ২০০২
৪৩. এ কে খন্দকার, *১৯৭১ : ভেতরে বাইরে*, ঢাকা : প্রথমা প্রকাশন, ২০১৪
৪৪. ড. মুহাম্মদ এনামুল হক, *বঙ্গে সুফী প্রভাব*, ঢাকা : রায়মন পাবলিশার্স, চতুর্থ মুদ্রণ ২০১৫
৪৫. মো. এনায়েত উল্যা পাটওয়ারী, *স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে ইসলামপন্থীদের ভূমিকা*, ঢাকা : প্রীতি প্রকাশন, ২০০২
৪৬. প্রফেসর ড. এমাজউদ্দিন আহমদ, *রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কথা*, ঢাকা : বাংলাদেশ বুক করপোরেশন লি., ২০০৯
৪৭. প্রফেসর ড. এমাজউদ্দিন আহমদ, *বাংলাদেশে গণতন্ত্রের সংকট*, প্রকাশক : সুলতান আহমদ, ১৯৯১
৪৮. কামরুদ্দিন আহমদ, *পূর্ব বাংলার সমাজ ও রাজনীতি*, ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স
৪৯. অধ্যাপক খুরশিদ আহমদ, *গোঁড়ামি, অসহনশীলতা ও ইসলাম*, আবুল আসাদ অনূদিত, ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ২০০২
৫০. গোলাম আহমাদ মোর্তুজা, *চেপে রাখা ইতিহাস*, বর্ধমান, (ভারত: বিশ্বঙ্গীয় প্রকাশন, ষষ্ঠ মুদ্রণ ১৯৯৬
৫১. আল্লামা ছফিউর রহমান মোবারকপুরী, *আর রাহীকুল মাখতুম*, খাদিজা আখতার রেজায়ী অনূদিত, ঢাকা : আল কুরআন একাডেমি লন্ডন, বাংলাদেশ কার্যালয়, ১৯৯৯
৫২. জওহরলাল নেহরু, *পৃথিবীর ইতিহাস, প্রবোধ চন্দ্র দাস গুপ্ত অনূদিত*, ঢাকা : বুক ক্লাব, ২০১৪
৫৩. জয়া চ্যাটার্জী, *বাঙলা ভাগ হলো : হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা ও দেশ বিভাগ*, আবু জাফর অনূদিত, ঢাকা : দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, তৃতীয় সংস্করণ, ২০১৪
৫৪. জিয়াউল হক, *ইসলাম : সভ্যতার শেষ ঠিকানা*, ঢাকা : গার্ডিয়ান পাবলিকেশন, ২য় সংস্করণ, ২০১৯
৫৫. জিবলু রহমান, *১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান ও মাওলানা ভাসানী*, শুভ প্রকাশন, ২০০৪
৫৬. জগলুল আলম, *বাংলাদেশে বামপন্থী রাজনীতির গতিধারা ১৯৪৮-৮৯*, ঢাকা : প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ১৯৯০
৫৭. জালাল ফিরোজ, *পার্লামেন্টারি শব্দকোষ*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, পরিমার্জিত সংস্করণ ২০১০
৫৮. জাফর ইমাম বীর বিক্রম, *দাম দিয়ে কিনেছি এই বাংলা*, ঢাকা : ঐতিহ্য প্রকাশনী, ২০১৬
৫৯. জি, ডব্লিউ, চৌধুরী, *অখণ্ড পাকিস্তানের শেষ দিনগুলি*, সিদ্দীক সালাম অনূদিত, ঢাকা : হককথা প্রকাশনী, ১৯৯১
৬০. জুলফিকার আহমদ কিসমতি, *আজাদি আন্দোলনে আলেম সমাজের সংগ্রামী ভূমিকা*, ঢাকা : ১৯৭০
৬১. জাস্টিস মুফতি মুহাম্মদ তাকী উসমানী, *ইসলাম ও রাজনীতি*, মাওলানা শামসুল আলম অনূদিত, ঢাকা : মাকতাবাতুল আশরাফ, পঞ্চম মুদ্রণ ২০০৮

৬২. জাস্টিস মুফতি মুহাম্মদ তাকী উসমানী, *ইসলাম ও আধুনিকতা*, মাওলানা আব্দুল হালিম অনূদিত, ঢাকা : মাকতাবাতুল হেরা প্রকাশনী, ২০১৬
৬৩. তালুকদার মনিরুজ্জামান, *বাংলাদেশের রাজনীতি : সংকট ও বিশ্লেষণ*, ঢাকা : বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লি., ২০০১
৬৪. ড. তাহির আমিন, *জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদ: উদারতাবাদ, মার্কসবাদ ও ইসলাম*, ড. ম মনিরুজ্জামান অনূদিত, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থট, ২০০৮
৬৫. দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, *জীবন দর্শনের পুনর্গঠন*, ঢাকা : দি ইউনিভার্সেল একাডেমী, ২০০৯
৬৬. দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, *ইসলামী আন্দোলন যুগে যুগে*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০
৬৭. দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, *জীবন সমস্যার সমাধানে ইসলাম*, ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৬
৬৮. মাওলানা নুর মোহাম্মদ আজমী, *হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস*, ঢাকা : এমদাদিয়া পুস্তকালয়, পুণর্মুদ্রণ ২০০৮
৬৯. প্রফেসর ড. নাজিমুদ্দীন এরবাকান, *ইসলাম ও বিজ্ঞান*, মো. বুরহান উদ্দিন অনূদিত, ঢাকা : প্রত্যয় প্রকাশনী, ২০১৪
৭০. ডব্লিউ. ডব্লিউ. হান্টার, *দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস*, এম. আনিসুজ্জামান অনূদিত, ঢাকা : খোশারোজ কিতাব মহল
৭১. পিনাকি ভট্টাচার্য, *মার্কিন ডকুমেন্টে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ '৭১*, ঢাকা : সূচীপত্র, ২০১৭
৭২. পি কে হিট্রি, *আরব জাতির ইতিহাস*, ১৯৫১
৭৩. ফারুক চৌধুরী, *জীবনের বালুকাবেলায়*, ঢাকা : প্রথমা প্রকাশন, ২০১৬
৭৪. বদরুদ্দীন উমর, *বাংলাদেশের রাজনীতি*, ঢাকা : জাগৃতি প্রকাশনী, ২০১৩
৭৫. বদরুদ্দীন উমর, *রাজনীতি শিক্ষা সংস্কৃতি*, ঢাকা : কাশবন প্রকাশন, ২০১২
৭৬. বদিউজ্জামান সাইদ নুরসি, *উম্মতের মরণে জীবনের আর্তনাদ*, আহমদ বদরুদ্দীন খান অনূদিত, ঢাকা : মাসিক মদীনা পাবলিকেশন্স, ২য় প্রকাশ ২০১৭
৭৭. বট্টাভ রাসেল, *শিক্ষা ও সমাজ কাঠামো*, আরশাদ আজিজ অনূদিত, ঢাকা : অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ২০০৭
৭৮. বারাক ওবামা, *দ্য অ্যাডাসিটি অব হোপ*, মাসুমুর রহমান খলিলী ও মাসুম বিল্লাহ অনূদিত, ঢাকা: অংকুর প্রকাশনী, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১৩
৭৯. মঈদুল হাসান, *মূলধারা : '৭১*, ঢাকা : দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড-ইউপিএল, ১৯৮৫
৮০. মওদূদ আহমদ, *কারাগারে কেমন ছিলাম*, ঢাকা : দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০১৩
৮১. মওদূদ আহমদ, *চলমান ইতিহাস : জীবনের কিছু সময় কিছু কথা*, ঢাকা : দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০৯
৮২. মহিউদ্দিন আহমদ, *আওয়ামী লীগ : উত্থান পর্ব ১৯৪৮-১৯৭০*, ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০১৭
৮৩. মাহমুদ হাসান, *দিনপঞ্জি একাত্তর*, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০১৩
৮৪. অধ্যাপক ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *আধুনিক মুসলিম বিশ্ব: তুরস্ক, ইরান, আফগানিস্তান*, ঢাকা : নভেল পাবলিশিং হাউস, ২০০৬

৮৫. মাহমুদুর রহমান মান্না, বাংলাদেশের ছাত্ররাজনীতি : অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ, ঢাকা : রুক্মিণী শাহ ক্রিয়েটিভ পাবলিশার্স, তৃতীয় সংস্করণ, ২০১৫
৮৬. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, অসমাপ্ত আত্মজীবনী, ঢাকা : দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০১২
৮৭. আল্লামা মুশাহিদ বায়মপুরী, আল-ফুরকান, সৈয়দ মাহমুদুল হাসান অনূদিত, সিলেট : ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী, ২০১১
৮৮. মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক, জামায়াতে ইসলামী : অভিজ্ঞতা ও মূল্যায়ন, চট্টগ্রাম : সমাজ ও সংস্কৃতি অধ্যয়ন কেন্দ্র, ২০১৬
৮৯. মো. রফিকুল ইসলাম, বাংলায় মুসলিম রাজনীতি : ১৯২৩-১৯৪৭, পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ইতিহাস বিভাগের অধীনে সম্পাদিত), মে ২০১৬
৯০. রাহুল সাংকৃত্যায়ন, ইসলাম ধর্মের রূপরেখা, কলকাতা : চিরায়ত প্রকাশন
৯১. রিজভী আহমেদ, শিক্ষা ও রাজনীতি, ঢাকা : এশিয়া পাবলিকেশনস, ২০১১
৯২. রিটা মে কেলি ও মেরি বুটিলিয়ার, রাজনৈতিক নারীর অভ্যুদয়, নুরুল ইসলাম খান অনূদিত, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯১
৯৩. আল্লামা শামসুল হক ফরিদপুরী, ধর্ম ও রাজনীতি, ঢাকা, বিশ্বকল্যাণ পাবলিকেশনস, ২০০১
৯৪. মুফতি মুহাম্মদ শাফী, মা'রেফুল কুরআন, মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত
৯৫. শ্রীমধুসূদন, ৩০ বছরের বামফ্রন্ট-শাসনে আমরা কেমন আছি, কলকাতা : আনন্দ প্রকাশন, ২০০৮
৯৬. সরদার ফজলুল করিম অনূদিত, প্লেটোর রিপাবলিক, ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ত্রয়োদশ মুদ্রণ, ২০১৪
৯৭. সরদার ফজলুল করিম, দর্শনকোষ, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৫
৯৮. সমরেন্দ্রনাথ সেন, বিজ্ঞানের ইতিহাস, ২য় খণ্ড
৯৯. সুব্রত শংকর ধর, বাংলাদেশের সংবাদপত্র, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫
১০০. সুরজিৎ দাশগুপ্ত, ভারতবর্ষ ও ইসলাম, কলকাতা : ডিএম লাইব্রেরী, ১৯৯১
১০১. স্টালিন সরকার, বাংলাদেশের রাজনীতি, ঢাকা : রুমা পাবলিকেশন, ২০০১
১০২. অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, ইসলামী আন্দোলন ও সাফল্য, ঢাকা : বিশ্বকল্যাণ পাবলিকেশনস, ২০১৪
১০৩. সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, রাজনীতির অভিধান, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৩য় মুদ্রণ ২০১৩
১০৪. সম্পাদনা পরিষদ, জামারানের পির (ইমাম খোমেনী স্মরণে), ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা, ১৯৯৪
১০৫. হাসান হাফিজুর রহমান, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলীলপত্র, ২য় খণ্ড, ঢাকা : তথ্য মন্ত্রণালয়, ১৯৮২
১০৬. বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়ভার, ঢাকা : প্রথমা প্রকাশন, ২০১০
১০৭. বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, গঙ্গাঋদ্ধি থেকে বাংলাদেশ, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, তৃতীয় পুনর্মুদ্রণ, ২০১৮
১০৮. বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, নাগরিকদের জানা ভালো, ঢাকা : প্রথমা প্রকাশন, ২০১৫

১০৯. ড. হাসান মোহাম্মদ, *বাংলাদেশের মাদ্রাসা শিক্ষা*, ঢাকা, ২০০৪
১১০. ড. হাসান মোহাম্মদ, *জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ : নেতৃত্ব, সংগঠন ও আদর্শ*, ঢাকা : একাডেমিক পাবলিশার্স, ১৯৯৩
১১১. Abid Ullah Jan, *Moderate Islam: A Product of American Extremism*, *American Journal of Islamic Social Sciences*, (jointly published by Association of Muslim Social Scientists and International Institute of Islamic Thought, Herndon, V.A., U. S. A.), Vol. 22, No. 3, 2005
১১২. Ahmed Davutoglu, *Alternative Paradigms: The Impact of Islamic and Western Weltanschauung on Political Theory*, Maryland, University Press of America, 1994
১১৩. Syed Abul Hasan Ali Nadvi, *Hazrat Mawlana Mohammad Ilyas Ilyas (r.a) Aur Un Ki Deeni Da'wat*, Lucknow, Uttar Pradesh (India): Tanveer Press, 1960
১১৪. Anwar Ahmad Qadri, *Islamic Jurisprudence in the Modern World*, Delhi: Taj Company, 1997
১১৫. M. Anwarul Haq, *The Faith Movement of Mawlana Muhammad Ilyas*, London: George Allen & Unwin, 1972
১১৬. Bhuiyan Md. Monoar Kabir, *Politics and Development of The Jamaat-e-Islami*, Dhaka: AH Development Publishing House, 2006
১১৭. Bernard Crick, *In Defense of Politics*, London: Pelican Books, 1964
১১৮. Carlton J. H. Hayes, *The Historical Evolution of Modern Nationalism*, UK: Macmillan, 1931, (latest 1960)
১১৯. Donald Eugene Smith. *Religion and Political Development*, Boston (US): Little Brown, 1970
১২০. E. E. Schattschneider, *Two Hundred Million Americans In Search of A Governmen*, New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc., 1969
১২১. Ernest Barker, *The Politics of Aristotle*, New York: Oxford University Press, 1958
১২২. Fauzi M. Najjar, *Siyasa in Islamic Political Philosophy*, in *Islamic Theology and Philosophy: studies in honor of George F. Hourani*, ed. M. E. Marmura, Albany: State University of New York Press, 1984
১২৩. Faroque Amin, *Social Welfe Program of Islamic Political Party: A Case Study of Bangladesh Jama'at Islami*, Sydney: University of Western Sydney, 2016
১২৪. Hamid Enayat, *Modern Islamic Political Thought*, UK: Macmillan Publishers Ltd, 1982, original published from the University of Michigan
১২৫. Hamidullah, Dr. Muhammad, *The First Written Constitution of the world*, (Lahore: Muhammad. Ashraf, 1975)

১২৬. Hans Kohn, *Nationalism: Its Meaning and History*, New Jersey: Princeton University Press, 1955
১২৭. Harun-or-Rashid, *Foreshadowing of Bangladesh*, Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 1987
১২৮. Iqbal, Muhammad, *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*, (First published by Dodo Press, 1930, Later published by Muhammad. Ashraf, Lahore, 1971)
১২৯. Iredell Jenkins, *Social Order and Limits of Law: A Theoretical Essay*, New Jersey: Princeton University Press, 1980
১৩০. Ismail R. Al-Faruqi, *Tawhid: Its Implications for Thought and Culture*, Herndon, International Institution of Islamic Thought, 1982
১৩১. Jawaharlal Nehru, *Toward Freedom*, New York: John Day, 1941
১৩২. John L. Esposito, *Islam and Politics*, New York: Syracuse University Press, 1998
১৩৩. Joseph Schumpeter, *Capitalism, Socialism and Democracy*, (New York: Harper & Brothers, 3rd edition 1950)
১৩৪. Kalim Bahadur, *The Jamat-e-Islami of Pakistan: Political Thought and Political Action*, Lahore: Progressive Books, 1978
১৩৫. Leonard Binder, *religion and politics in Pakistan*, Berkeley: University of California, 1961
১৩৬. H. J. Laski, *Parliamentary Government in England*, Australia: George Allen & Unwin, 1952
১৩৭. Malcolm H. Kerr, *Islamic Reform: The Political and Legal Theories of Muhammad Abduh and Rashīd Rida*, Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1966
১৩৮. Nirad C Chaudhuri, *Thy Hand, Great Anarch! India, 1921-1952*, Boston: Wesley Publishing Company, 1987
১৩৯. Robert A. Dahl, *Modern Political Analysis*, Prentice-Hall, New Jersey: Englewood Cliffs, 1970
১৪০. Professor Dr. Rounaq Jahan, *Political Parties in Bangladesh Challenges of Democratization*, Dhaka: Prothoma Prokashon, 2005
১৪১. Dr. U.A.B. Razia Akter Banu, *Islam in Bangladesh*, Dhaka: Bangladesh Institute of Islamic Thought, 2012
১৪২. Shah Ahbul Halim, *The Way Out: Bangladesh Islamists' Impasse*, Dhaka, Bangladesh Centre of Islam and Pluralism, 2011

১৪৩. Talukdar Maniruzzaman, *The Bangladesh Revolution and its Aftermath*, Dhaka: The University Press Limited, 2nd edition 1988
১৪৪. Tariq Ramadan, *Islam, the West and the Challenges of Modernity*, The Islamic Foundation, Liecester, UK, Reprinted, 2004
১৪৫. Journal of the Asiatic Society of Bangladesh, Vol. 57 (1), 2012
১৪৬. ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ৪৬ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৬
১৪৭. কওমী মাদ্রাসা : ইতিহাস ঐতিহ্য অবদান (স্মারক), ঢাকা : দারুল উলুম মাদ্রাসা, মিরপুর, ২০১৪
১৪৮. সেমিনার স্মারক, জামিয়া মাদানিয়া আঙ্গুরা মোহাম্মদপুর মাদ্রাসা, সিলেট, ২০০৩
১৪৯. দর্শন ও প্রগতি (জার্নাল), গোবিন্দ চন্দ্র দেব দর্শন গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১১শো বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ১৯৯৪
১৫০. বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি পত্রিকা, ঢাকা, সংখ্যা ২৭-২৮, ১৪০৯-১১
১৫১. মুক্তিযুদ্ধ ই-সংকলন, খণ্ড-০১, সংকলনে- মুক্তিযুদ্ধ ই-আর্কাইভ ট্রাস্ট, প্রথম সংস্করণ : নভেম্বর ২০১৭
১৫২. 'লেখিকা প্রাঙ্গণ' বাংলাদেশ সংস্কৃতিকেন্দ্র, ঢাকা, কর্তৃক প্রকাশিত সংকলন, ২০১২
১৫৩. সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ১৯৮১ সালের ১৭ এপ্রিল প্রকাশিত সংখ্যা